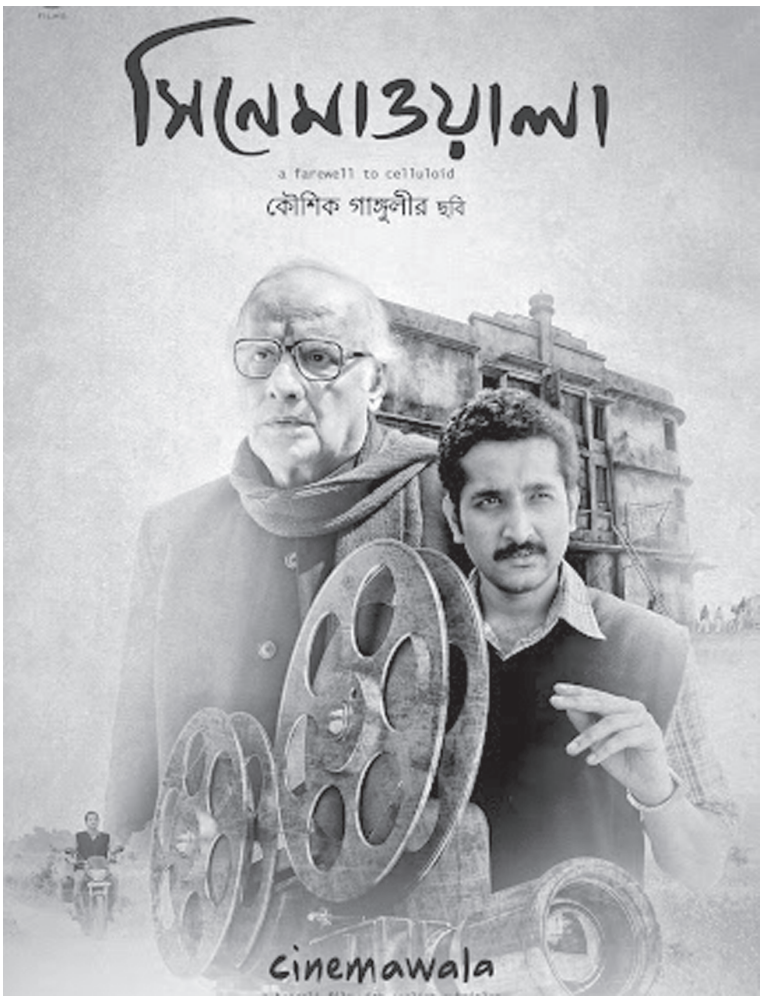

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'সিনেমাওয়ালা' ছবির পোস্টার।

প্রেক্ষাগৃহহীন বাংলা ছবি

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পহেলগাঁও পরবর্তী আধা যুদ্ধকালীন একটি সপ্তাহ এবং দেশের নিরীহ পর্যটকদের ওপর নির্মম জেহাদি আক্রমণের রেশ যখন দেশবাসীকে মানসিকভাবে গনগনে আগুনের ওপর বসিয়ে রেখেছে, সে সময় দেশের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন সমান উদ্বিগ্ন এবং দেশবাসীর মৃত্যুতে অধীর। ২২ এপ্রিল ২০২৫-এর গণহত্যা পরবর্তী পর্যায়ে ২৪ এপ্রিল বিহারের মধুবনী জেলায় একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁর মুখাবয়বে ফুটে ওঠা প্রতিক্রিয়া

দেখে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি কারও। এরপরই ১৫ দিনের মাথায় দেখা গেল ভারতের পরাক্রম। সেটা কেমন, কীরকম বা তার ফলশ্রুতি এসব এখন আলোচ্য নয়। কিন্তু তার অভিঘাত যে কত নির্ভুল ও নির্ণায়ক হয়েছিল তা একটি আপাত অসংশ্লিষ্ট কারণের মাধ্যমে বেরিয়ে এল।

প্রধানমন্ত্রী এই সামরিক প্রত্যাঘাতটির একটি অব্যর্থ নাম দিয়েছিলেন 'Operation Sindoor'। অর্থাৎ প্রত্যাঘাতটির নাম ছিল মর্মস্পর্শী। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা মহিলাদের সিঁদুর মুছে দেওয়ার বীভৎস উন্মাদনায় তাঁদের স্বামীদের মাথায় গুলি করেছিল। বিষয়টা নিতান্তই জান্তব মানসিকতার চরম বহিঃপ্রকাশ। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে কেঁপে উঠেছিলেন প্রধানমন্ত্রীও। তাই প্রতিশোধের অভিযানের নাম তিনি দিয়েছিলেন 'সিঁদুর'। সিঁদুর যখন কেড়ে নিয়েছ তখন দেখো সিঁদুরের জোর কত। সন্ত্রাস পীড়িতদের প্রতি ন্যায়বিচার এবং জেহাদিদের উপর প্রত্যাঘাতের সংমিশ্রণের নির্যাস এই সামরিক প্রত্যাক্রমণ।

বিষয়ান্তরে বাংলা সিনেমার দুর্দশা, প্রেক্ষাগৃহের অভাবে তার প্রদর্শনজনিত করুণ পরিণতি ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে সম্প্রতি নানা কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু যতই অকিঞ্চিৎকর করে আজকের তথ্যনিষ্ঠ ও সমাজ-সম্পৃক্ত ছবিগুলিকে দেখা হোক না কেন তাদের আপামর আকর্ষণকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সে কথায় পরে আসছি। গত ১১ মে'র টাইমস অফ ইন্ডিয়া সংবাদপত্রের একটি পৃষ্ঠার অর্ধেক অংশ জুড়ে ছিল 'সিঁদুর'-এর রক্ত রং।

''Film producers' associations get an overwhelming number of applications for the title sindoor''— দেখুন এই সুযোগসন্ধানীরা দেশবাসীর নাড়ী ঠিক জায়গায় ধরেছে। সারা ভারত যখন উদ্বেল তখন 'সিঁদুর' প্রত্যাঘাতের সাফল্যে।

দক্ষিণের বিখ্যাত জেপি দত্ত ব্যানারে যে সব বড়ো বড়ো ছবি প্রযোজিত হয় তাঁরা এই নামটি পেটেন্ট করে নিতে চাইছে। ইতিমধ্যেই জনা পনেরো আবেদনকারীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে নামটা কার কপালে শিকে ছিঁড়বে? দেখুন, সিনেমার জোর বা মাহাত্ম্য। প্রযোজকরা বলছেন যখনই কাউকে মুখবন্ধ খাম নিয়ে অফিসে ঢুকতে দেখছেন, তাঁকে বলছেন ''কি ব্যাপার? 'Operation Sindoor বা Mission Sindoor' যদি হয়, তো ঘাবড়াবেন না। আপনার আগে এক দল কড়া নাড়ছে।'' দক্ষিণের এক প্রযোজক তো ইতিমধ্যেই 'সিন্দুর এক জঙ্গ' (লড়াই) নামও ঠিক করে ফেলেছেন, তবে অনুমোদনের অপেক্ষা।

প্রযোজকদের তরফ থেকে খুবই আন্তরিকভাবে বলা হচ্ছে এই প্রচেষ্টা কিন্তু সর্বতোভাবে আমাদের দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের কারণেই। দেশের সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁদের অগাধ সম্মানের কথাও তাঁরা বলেছেন। সে কারণে সুযোগসন্ধানী কথাটা সর্বার্থে গ্রহণীয় নিশ্চয় নয়। একই অঙ্গে এত রূপের মতো নানান প্রযোজকরা 'সিন্দুর কা যুদ্ধ', 'অপারেশন সিন্দুর', 'সিন্দুর দ্য রিভেঞ্জ', 'অপারেশন সিন্দুর জয় হিন্দ' ইত্যাকার নামের অঢেল স্বপ্নে মগ্ন। বিষয়টা প্রমাণ করে সিনেমায় কেবলমাত্র কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে দর্শককে বীভৎস উত্তেজেনায় চমকে দেওয়াই শেষ কথা নয়। দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মানেই দীর্ঘকালীন সার্থকতা।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে এখন কি দর্শকের ভালা লাগার উপকরণ সংবলিত জীবনমুখী কোনো বিষয়ই পর্দায় বিচ্ছুরিত হয় না? হয়, সংখ্যায় কম হলেও তা সীমাবদ্ধ থাকে বিপুল খরচসাপেক্ষ 'মল'গুলির বৈভবের মধ্যে। অনেক সময়ই নিবিড় মনঃসংযোগ ও আবেগসঞ্জাত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি নিয়ে পরিচালকের পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশন চিত্রগৃহের পারিপার্শ্বিক আড়ম্বর ও দর্শককুলের নির্দিষ্ট উপভোগস্পৃহার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই হারিয়ে যায়। এখানে মানসিক অনুশীলনের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণও একই সঙ্গে চলে। অতীতের সেই আলো-অন্ধকারময় ঘরোয়া, পরিচিত পরিবেশের মায়াপুরীর অদৃশ্য আলিঙ্গন আর অনুভব করা যায় না। সিনেমা প্রদর্শন ও দর্শক চরিত্র (এখানে যে দর্শক সিনেমা অনুরাগী, বা চলচ্চিত্রপ্রেমী হিসেবে সিনেমা দেখতে যান এবং সিনেমা দেখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাদের প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছে) অতীতচারিতা বা স্মৃতিমেদুরতা সকল মানুষের মধ্যেই চলমান থাকে। শুধু তাকেই বিষয় করা নয়। বিষয় অতীতকে ফিরে দেখার আকাঙ্ক্ষা। বিশ্ব সিনেমায় এই প্রয়োজন দীর্ঘদিন আগেই ধরতে পেরেছিলেন প্রখ্যাত হলিউড পরিচালক আমেরিকান মার্টিন স্করসিস। তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তৈরি করেছিলেন TFF (The Film Foundation)। স্করসিস একান্ত চেষ্টায় বেছে বেছে বিশ্বের যুগান্তকারী ছবিগুলিকে বিপুল খরচে পুনরুদ্ধার করা শুরু করেন। ভারতের তরফে অনেকদিনই যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট সিনেমাপ্রেমী, Film Heritage Foundation-এর মহেন্দ্র সিংহ দুঙ্গরপুর। এখন ভরপুর ছবি বেরোচ্ছে ৮০ ঊর্ধ্ব শর্মিলা ঠাকুর, সিমি গ্রেওয়াল, সৌমিত্রবাবুদের। ৫৫ বছর আগে ১৯৭০ সালে নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র ফ্রান্সের অভিজাত ও চলচ্চিত্র কৌলীন্যে পথিকৃৎ Cannes (কান) চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ মর্যাদায় পুনরুদ্ধৃত সংস্করণের প্রদর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৪ থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসপঞ্জী নির্মাণ করলে তার মধ্যে দেখা যাবে বিভিন্ন ওজনের, চিন্তনের মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে। কিছু কিছু শোনা গেছে যে, আর প্রদর্শন যোগ্য নয়। এর মধ্যে একেবারে প্রথম দিকের হীরালাল সেন, দেবকী বসু প্রমুখের মতো বহু দিকপাল মানুষের চলচ্চিত্র কর্মও রয়ে গিয়েছে। সিনেমাপ্রেমীরা ইচ্ছে থাকলেও সেগুলির আর ছোঁয়া পাবেন না। এ প্রসঙ্গে মনে হয় অর্থের অভাব বড়ো বিষয়। কিন্তু আমরা তো museum (মিউজিয়াম) করে অনেক পুরনো স্মৃতি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যত্নে সংরক্ষণ করি। কয়েক হাজার ছবির মধ্যে কয়েকশো ছবিকে এ বিষয়ে কৃতবিদ্য, পারদর্শী মানুষদের নিরীক্ষণ সাপেক্ষে কি ধরে রাখা যায় না? আমাদেরই অতীত ইতিহাস তো ধরা থাকবে।

আজকে ভাবতে বিষণ্ণ লাগে যে, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, এমন কী উত্তম কুমার অভিনীত 'শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক', 'মনের ময়ূর' প্রভৃতি ছবিও আর দর্শনগ্রাহ্য নয়।

শুধু বইকে ঝেড়ে ঝুড়ে র‍্যাকে তুলে রাখা নয়। সরকারের কোটি কোটি টাকা নানাভাবে অপব্যয় হয়। উৎসুক মানুষ যদি তার পূর্বপুরুষদের জীবনচর্যায় পরিধেয়, লোকাচার, সংস্কৃতির বহমানতা যা সত্যনিষ্ঠভাবে বহু চলচ্চিত্রের রিলগুলির মধ্যে চিত্রায়িত হয়ে রয়েছে তাকে দেখতে বা জানতে চায়, তবে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় অন্তত একটি প্রেক্ষাগৃহে অর্থকরী ক্ষতি হলেও সেগুলির প্রদর্শন কি নিতান্তই অসম্ভব? অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্রে এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। তাই এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ রয়েছে।

অভিভাবকদের প্রাথমিক গর্বের পরিসরটি ক্রমে এক অসহ্য মানসিক চাপ ও নিঃসঙ্গতা তৈরি করে। সে সময় অনেকেই কৈশোরের পুস্তকপ্রীতি, কেউ-বা গান শোনার অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনেন। নিঃসঙ্গতা দূর করতে 'সিনেমা' এক অন্যতম মাধ্যম যা মানুষের খারাপ সময়ে মনকে সমবেদনার প্রলেপ দিয়ে যায়। অনেকেই জানেন যে PVR আর OTT-র সঙ্গে সাধারণ চলচ্চিত্রপ্রেমীর এক পর্দার অভ্যস্ত খরচে সিনেমা দেখা দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গে এক পর্দার প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ৭৫০ থেকে ২৫০-এ নেমে যাওয়ার কারণে ২০১৫ সালে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছবিটিকে যেন এই ক্রমহ্রাসমান প্রেক্ষাগৃহগুলির উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছিলেন। সেটি চলচ্চিত্র প্রেমের এক অভিনব নিদর্শন। আজ সেই সংখ্যার নিম্নমুখী অভিযান আরও বেগবান হয়েছে। 'সিনেমাওয়ালা'

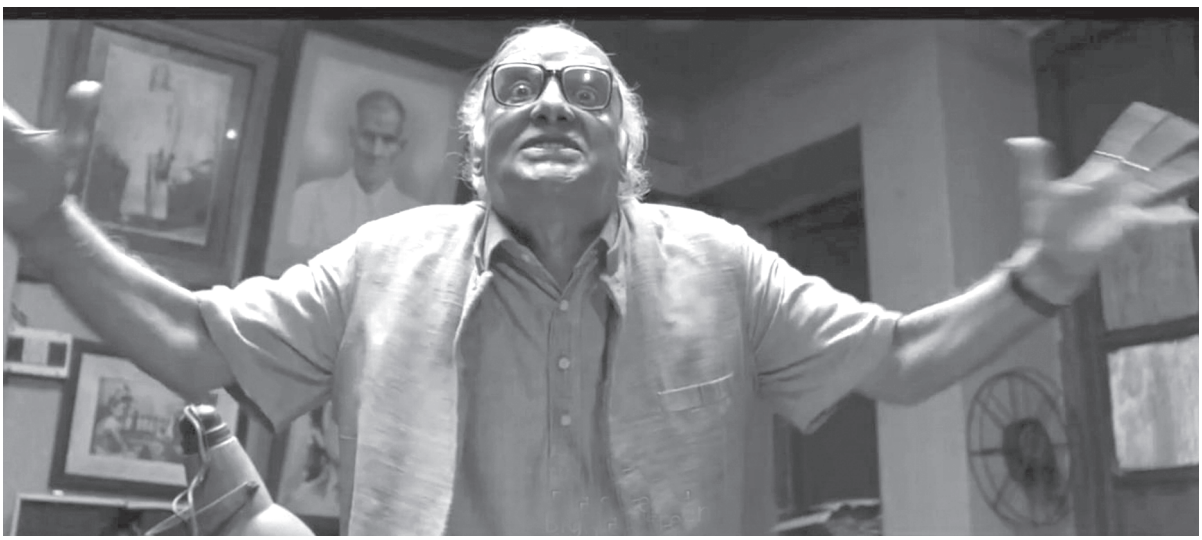

'সিনেমাওয়ালা' ছবির একটি দৃশ্য।

এই রাজ্যের বহু জেলায় অসংখ্য প্রেক্ষাগৃহ ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্গেরই এক যশস্বী পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। ২০১৫ সালে তিনি নির্মাণ করেছিলেন অত্যন্ত মননশীল এক ছবি 'সিনেমাওয়ালা'। সেখানে কোনো রূপবান নায়ক বা প্রখর রুদ্র ধরনের গোয়েন্দাও ছিল না। নায়িকা তো নয়ই। আপন মুন্সিয়ানায় তিনি অনবদ্য অভিনেতা পরান বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যবহার করেছিলেন। আদ্যন্ত সিনেমাপ্রেমিক পরানের একটি গ্রামীণ সিনেমা হল ছিল। সেটি অবশ্যই এক পর্দার। কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে সেই প্রেক্ষাগৃহে ছবির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন পরানের কথায় 'রূপকথার রাজপুত্তুর উত্তম কুমার'। এই সিনেমার একটি দৃশ্যে প্রজেক্টর চালক অভিন্ন হৃদয় বন্ধু একটু তির্যক মন্তব্য করায় তাকে প্রায় মারতে ওঠেন তিনি।

অধিকাংশ মানুষের পরিবার-পরিজন সন্তানসন্ততি নিয়ে জীবন পরিক্রমা চলে। কিন্তু আজকাল অনেকেরই ছেলে-মেয়েরা বিদেশে তথাকথিতভাবে সেটলড্ বা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। ছবিটিতে প্রেক্ষাগৃহের অবশ্যম্ভাবী বিলয়ের হতাশায় প্রেক্ষাগৃহের মালিকের (মালিকের চরিত্রে অভিনয় করেন পরান বন্দ্যোপাধ্যায়) আজীবন সাথী প্রজেক্টর অপারেটর প্রজেক্টর বিক্রির পর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। এর পরই একটি মর্মভেদী আর্তনাদ করেন পরান। তিনি যেন এক আপোশহীন 'সিনেমাওয়ালা'। হ্যাঁ, এক পর্দার (single screen)। এর পরই মনের অর্ন্তলীন বেদনায় আক্রান্ত ও অবশ্যম্ভাবী প্রেক্ষাগৃহ বিনাশের যন্ত্রণায় পরান নিজের সিনেমা হলে নিজেই আগুন ধরিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। তিনি এক পর্দার অলঙ্ঘ্যতা থেকে সরেননি। এই অসাধারণ ছবিটি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এমন দুঃসাহসিক ছবিটি দেখার সুযোগ খুব কম বাঙ্গালিই পেয়েছেন কেননা 'নন্দন' ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। অন্য প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বেশিরভাগ কমার্শিয়াল ছবি চলে। আর আগেকার মতো দেওয়ালে খবর দিয়ে পোস্টারও মারা হয় না। আমরা খুবই আলটপকা মন্তব্য করে থাকি যে, আজকালকার বাংলা ছবি কহতব্য নয়। কথাটা আংশিক সত্য মাত্র।

কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' ছায়াছবির একটি দৃশ্য।

আজকের কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় আশ্চর্য দক্ষতায় ঋত্বিক ঘটককে নতুন প্রজন্মের বাঙ্গালিকে চিনিয়েছেন। ঋত্বিকের ছবি তো মাত্র ৮টি। সেগুলি কে আর দেখাবে তাই পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ঋত্বিক ও তাঁর চিত্রকর্মকেই গভীর নৈপুণ্যে ও ভালোবাসায় চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন। কিন্তু যাদের জন্য করা তারাই দেখার সুযোগ পেল না। প্রেক্ষাগৃহ কই? কমলেশ্বর বলেছেন যে, দক্ষিণের ডাব করা ছবি বাঙ্গালি, হিন্দীভাষী দর্শকরা দেখছেন। দক্ষিণের ছবি সংলগ্ন চারটি রাজ্যে বাজার পায়। সেখানেও মননশীল ছবি তৈরি হয় যা বাঙ্গালি চায়। পরিচালক বাংলা সিনেমাকে বাঁচাতে অনেক হল তৈরির কথা বলেছেন। তাঁর কথায় বহু রাজ্যেই নিয়ম আছে সেখানে যে সিনেমা তৈরি হবে তা নিজ রাজ্যে নির্দিষ্ট সময় বাধ্যতামূলকভাবে চালাতে হবে। প্রশ্ন আসে, এক পর্দার ছবিঘর নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে কি? অথচ আমরা অনায়াসে ভুলে যাই এই বাংলা সিনেমার এক মহীরুহসম পরিচালক বিশ্বের দরবারে সর্বোত্তম চলচ্চিত্র স্বীকৃতি 'অস্কার পুরস্কার' দেশে নিয়ে এসেছিলেন। ভিডিয়ো সিডি বা DVD-তে সিনেমা দেখার পথও সিনেমাপ্রেমী মানুষদের কাছে বন্ধ। ভিসিআর এবং সিডি-ডিভিডি প্লেয়ারগুলির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুরনো ছবির ভিডিয়ো ক্যাসেট বা সিডি আর পাওয়া যায় না। পুস্তকপ্রেমী তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজনকে লেখাপড়া করে যান, কিন্তু পড়ে থাকে তাঁর আমৃত্যু লালিত স্নেহের বইগুলি। জীবনের প্রান্তবেলায় এগুলির পাতাই তাঁকে যেন ICU থেকে বার করে আনে। ব্যক্তিগত আলাপে কয়েকজনের কাছে জেনেছি এই আপাত প্রয়োজনহীন অথচ এই মানুষটির কাছে মননের অংশবিশেষ পুস্তক বিচ্ছেদের কথা তাঁরা মুখেই আনেন না। এই নিঃসঙ্গ সঙ্গীর (অর্থাৎ বইগুলি সম্পর্কে) আলোচনার সময় তাঁদের একজনের চোখদু'টি মায়াময় হয়ে উঠছিল।

একটি প্রশ্ন থেকে যায়। বইগুলি ইচ্ছে করলে পড়ার চেষ্টা করা যায়। সঙ্গীত রসিক রসভাণ্ডার ফোনে টেপ করে ভবিষ্যৎ শ্রবণকে নিশ্চিত করতে পারেন। ক্রীড়াপ্রেমী মাঠে ঘুরতে পারেন। কিন্তু একসঙ্গে ৫০০ বা ততোধিক মানুষের একই আনন্দ-বেদনায়, 'দুঃখ সুখের এপারে ওপারে' যাত্রার অংশীদার হওয়া অকল্পনীয়। অমিতাভ বচ্চন একবার বলেছিলেন একটি চিত্রগৃহের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত একদল মানুষ পরস্পর সংলগ্ন হয়ে বসে স্থিরদৃষ্টিতে একই আবেগের সঙ্গী হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। এ প্রেক্ষাগৃহ ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। এটি একটি যূথবদ্ধ আনন্দ নিকেতন।

সবই ঠিক আছে, কিন্তু সরকার নতুন হল নির্মাণের টাকা দেবে না। বচ্চনজীর মতো আরও বহু কোটিপতি, নিযুতপতি আছেন যাদের সমগ্র জীবন ও প্রতিষ্ঠা আবর্তিত হয়েছে এই প্রেক্ষাগৃহে সাময়িক অন্তরীণদের অর্থানুকূল্যে। তাঁরা সিনেমার সংলাপ ছেড়ে 'এক পর্দা'কে বাঁচাতে একটু যাকে বলে হাত খুলুন না। তাঁদের বদান্যতায় crowd funding-এও অনেকেই এগিয়ে আসবেন। না হয় খরচটা জলেই যাবে। তবু 'হাসি কান্নার দোল দোলানো' যে পালার কাছে থেকে তাঁদের যে রম্য জীবন অট্টালিকা আক্ষরিক অর্থে নির্মাণ করেছেন তার প্রতি মমত্ববোধ বা ঋণ বললেও ভুল বলা হবে না। সেই প্রচেষ্টায় তাঁরা একবার হাত দিতে পারেন। যতই PVR, OTT হোক না কেন তার সঙ্গে প্রাচী সিনেমার বাংলায় লেখা টিকিটে 'অলিন্দ'-এ বসে রাগ-অনুরাগের যে প্রহর কেটে ছিল তা চিরকালীনভাবে বিলীন হয়েছে। তাই প্রত্যেক জেলায় একটি করে হলে পুরনো ও একেবারে নতুন ছবি মিলিয়ে অন্তত এক সপ্তাহ করে চালাবার সুযোগ করে দিলে ক্ষতি হবে না। কয়েকটি প্রজন্ম আপনাদের নিষ্ক্রিয় কিন্তু সংবেদনশীল লীলাসঙ্গী হতে পারবে।

PVR, OTT, আর এক পর্দার প্রেক্ষাগৃহে একই জিনিস বিতরিত হয়। কিন্তু সাদা হলেও নুন, চিনি, ময়দা নিশ্চিতভাবে এক নয়। এটা জানলেই মঙ্গল। তবে 'জানার কোনো শেষ নাই। জানার চেষ্টা বৃথা তাই' (সত্যজিৎ রায়)।

ভাগ্য বিড়ম্বিত মহাবীর-দানবীর কর্ণ

গোপাল চক্রবর্তী

মথুরার যদুবংশে শূরসেন নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁর অনেক সন্তান ছিল। পিতৃস্বশ্রীয় ভ্রাতা নিঃসন্তান কুন্তিভোজ শূরসেনের কাছে একটি সন্তান প্রার্থনা করলে তিনি অসামান্য রূপবতী ও সর্বগুণ সম্পন্না কন্যা পৃথাকে দুহিতৃ রূপে দান করেন। কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা, তাই পৃথার নাম হয় কুন্তী। শৈশব থেকেই কুন্তী সর্বকর্মে নিপুণা ও দায়িত্বশীলা। ভোজরাজের প্রাসাদে নিত্য অতিথিদের আগমন, তাঁদের মধ্যে মুনিঋষিদের সংখ্যাই বেশি। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার উগ্রতপা। অতিথি সেবার যেন কোনো ত্রুটি না হয়, তাই ভোজরাজ কন্যা কুন্তীর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

বালিকা কুন্তীর সেবাযত্নে অতিথিরা পরমপ্রীত এবং চতুর্দিকে রাজার জয়জয়কার। এমনি ভাবেই চলছিল অতিথি সেবা। এই সময়ে একদিন অতিথি রূপে এলেন মহাক্রোধী মুনি দুর্বাসা। সমস্ত প্রাসাদ ত্রস্ত। কিন্তু বালিকা কুন্তী নির্বিকার যথাযথভাবে অতিথি দুর্বাসার সেবা করে চলেছে। প্রথমে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে মুনিকে বরণ করা হলো। আপন হাতে মুনির পদ প্রক্ষালন করল। চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দিয়ে মুনির ভোজন সমাপনের পর তাঁকে রত্নময় খাটে উত্তম শয্যায় শয়ন করানো হলো। বালিকা কুন্তী সর্বদা করজোড়ে মুনির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কখন তাঁর কী প্রয়োজন হয়। দুর্বাসা বেশ কিছুদিন কুন্তীভোজের প্রাসাদে হৃষ্টমনে অবস্থান করলেন। বালিকা কুন্তীর সেবা সেবাযত্নে মুনি পরম প্রীত। বিদায়কালে তিনি কুন্তীকে নিভৃতে ডেকে বললেন—

—আমি তোমাকে একটি গোপন মন্ত্র দিচ্ছি, এই মন্ত্র জপ করে তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করবে তিনি তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে আগমন করবেন।

দুর্বাসা কুন্তীর কানে এক গূঢ় মন্ত্র প্রদান করে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। দুর্বাসা চলে গেলেন কিন্তু বালিকা কুন্তীর মনে এক পরম কৌতূহল—মুনির দেওয়া এই গোপন মন্ত্র সত্যিই কার্যকর হবে কিনা? এই কৌতূহল নিরসনের জন্য একদিন নিভৃতস্থানে কুন্তী ওই মন্ত্র জপ করে দেব দিবাকরকে আহ্বান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানটি আলোকিত হয়ে গেল, কুন্তীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন সূর্যদেব। সেই আলোকময় মূর্তি দেখে কুন্তী মূর্চ্ছিতা হলেন। সূর্যের যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলো কুন্তীর। তিনি ভীত কণ্ঠে বললেন—

—হে দেব! শুধুমাত্র কৌতূহল বশে, মহর্ষি দুর্বাসার মন্ত্র পরীক্ষা করার জন্য আমি আপনাকে আহ্বান করেছি। আমাকে মার্জনা করবেন।

সূর্যদেব স্মিতহাস্যে বললেন—হে কন্যা, দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র বলে এবং তোমার আহ্বানে আমার আগমন হয়েছে। এই আগমন কদাপি বিফল হতে পারে না। তুমি আমাকে ভজনা করে পুত্রবর নাও। আমাকে ভজনা না করলে মুনির এই মন্ত্র নিষ্ফল হবে।

ভীতা কুন্তী করজোড়ে সূর্যকে বললেন—হে দেব, হে নাথ! আমি বালিকা, অনূঢ়া, এই অবস্থায় তোমার ভজনা করলে সংসারে আমার অপযশ হবে। গর্ভধারণ করলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না।

—কুন্তী, তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছ। আমাকে ভজনা করলে তোমার কোনও অপযশ হবে না। তুমি গর্ভধারণ করে সন্তান প্রসব করবে কিন্তু তোমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এই বলে দিবাকর সলাজ কম্পিত কলেবর তরুণী কুন্তীকে আলিঙ্গন করে তাকে পুত্রবর দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করলেন। কুমারী কুন্তী হর্ষ-বিষাদে ভাসলেন। ক্রমে দিন যায়, মাস যায় কুমারী কুন্তীর গর্ভ ক্রমে স্ফীত হতে থাকে, তাঁর সেই স্বভাবজাত চঞ্চলতা আর নেই। কুন্তীর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে রাজপ্রাসাদের এক প্রবীণা ধাত্রীর। কুন্তীরও তখন প্রয়োজন এক বিশ্বস্ত পরিচারিকার। একদিন নিভৃতে এই ধাত্রীর কাছে অকপটে সব কথা খুলে বলেন কুন্তী। ক্রমে গর্ভ আরও ভারী হতে থাকে। কুন্তী আবার স্মরণ করলেন দেব দিবাকরকে, তিনি আশ্বস্ত করলেন কুন্তীকে। সেই ধাত্রী গোপনে নিয়ে গেলেন এক নির্জন স্থানে। সূর্যের বরে কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা কুন্তী প্রসব করলেন কবচকুণ্ডলধারী এক দিব্য শিশু। কর্ণরন্ধ্রে জন্ম তাই নাম কর্ণ। পুত্রমুখ দর্শনে কুমারী কুন্তীর মাতৃস্নেহ উত্তাল হলো। কিন্তু এই সন্তানকে এই মুহূর্তেই বিদায় দিতে হবে। হাহাকার করে উঠল মায়ের মন। ধাত্রী সংগ্রহ করে আনল এক সুগঠিত তাম্রপেটিকা। তাতে সযত্নে স্থাপন করা হলো দেবকান্ত শিশুটিকে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার কেঁদে উঠল শিশুটি। মায়ের বুকেও হাহাকার, চোখে অশ্রুর বন্যা। ধাত্রীর সঙ্গে অপেক্ষা করছেন কুন্তী, রাত্রির অন্ধকার নামার জন্য। ধীরে ধীরে নামল অন্ধকার। পেটিকায় শায়িত শিশুটিকে নিয়ে দুই নারী ত্রস্তপদে এগিয়ে চলেছে রাজপ্রসাদের অদূরে বহমান অশ্বনদীর দিকে। রাজবাড়ির ঘাটে তখনও লোকজনের আনাগোনা। তাঁরা ঘাটে না গিয়ে এসে দাঁড়ালেন নদীতীরের এক নিভৃত স্থানে। ধাত্রী পেটিকাটি জলে ভাসাতে যাচ্ছিলেন, রোদুদ্যমান কুন্তী বাধা দেয়, পেটিকা ভূমিতে স্থাপন করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পুত্রের মুখের দিকে। ধাত্রী বোঝায়, রাত গভীর হচ্ছে, এতক্ষণে প্রাসাদে কুন্তীর খোঁজ শুরু হয়ে গেছে। এইবার প্রাসাদে ফিরতে হবে। অনেকটা জোর করে কুন্তীর হাত থেকে পেটিকাটি মুক্ত করে অশ্বনদীর জলে ভাসিয়ে দিল ধাত্রী। বাঁধভাঙা অশ্রুতে সিক্ত হলেন কুমারীমাতা কুন্তী। ধাত্রী তাঁকে ধরে নিয়ে পা বাড়ালেন রাজপ্রাসাদের দিকে। সবার অলক্ষ্যে ঘটে গেল এতবড়ো একটা ঘটনা। কেউ দেখল না, কেউ জানল না। সদ্যোজাত নিষ্পাপ দেবশিশুকে নিয়ে সেই তাম্রপেটিকা ভেসে চলল নামহীন গোত্রহীন, পরিচয়হীন, এক অন্ধকার, অনিশ্চিত ভবিতব্যের দিকে।

প্রাসাদে ফিরে রত্ন-পালঙ্কে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন কুন্তী। ধাত্রী শুরু করল তার জন্য নির্দিষ্ট কাজকর্ম। ততক্ষণে প্রসাদে খোঁজ শুরু হয়েছে রাজকন্যার, দীর্ঘ সময় ধরে কুন্তীকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় কুন্তী? অবশেষে তাঁর খোঁজ মিলল, আপন কক্ষে শয্যায় শুয়ে আছেন কুন্তী। কিন্তু তার চোখমুখের একি অবস্থা যেন দীর্ঘ রোগ ভোগ করে উঠেছে। বিচলিত পিতা কুন্তীভোজ রাজবৈদ্যকে সংবাদ দিতে বললেন। কুন্তী বারণ করে বললেন— না পিতা, রাজবৈদ্যের প্রয়োজন নেই। আমি ঠিক আছি। তবে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

কুন্তীভোজ বললেন—বলো মা, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

—আমি এক স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, আগামী একুশ দিন আমি আমার কক্ষে নিভৃতে সূর্যদেবের আরাধনা করতে চাই। এই একুশদিন আমি অন্য কোনো দেবর্চনা আর অতিথি সেবা থেকে বিরত থাকব।

—তাই হোক মা, তুমি নিভৃতে সূর্য আরাধনা কর। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। এই ক'দিন অতিথি সেবার দায়িত্ব তোমার মা নেবেন। আর দু'জন দাসী সর্বদা তোমার সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

স্মিতহাস্য দেখা দিল কুন্তীর মুখে। শুরু হলো পুত্র জন্মের আনন্দ অশৌচ। কিন্তু পুত্র কোথায়? সেই সদ্যোজাতকে নিয়ে অশ্বনদীতে ভেসে চলল সেই তাম্রপেটিকা। অনেক দূর ভেসে গিয়ে শেষে স্রোতের টানে এসে পড়ল চর্মস্বতী নদীতে। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে যমুনার জলে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম পেরিয়ে পেটিকা ভাসতে ভাসতে প্রবেশ করল গঙ্গার জলে। গঙ্গার স্রোতের টানে ভেসে চলেছে তাম্রপেটিকা, ভিতরে সদ্যোজাতের ক্রন্দন। গঙ্গাতীরে চম্পাপুরী এক ছোটো জনপদ। কয়েকঘর ক্ষত্রিয় আর সারথীদের বাস। জনপদের প্রধান অধীরথ সুত হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়পাত্র। নিষ্ঠাবান অধিরথ প্রতিদিন প্রাত:কালে পত্নী রাধাকে নিয়ে গঙ্গাস্নান করেন। যেদিনও স্নানে এসেছেন। হঠাৎ সূতপত্নী রাধা লক্ষ্য করেন গঙ্গার মাঝবরাবর একটি তাম্রপেটিকা স্রোতের টানে ভেসে চলেছে, সেই পেটিকার মধ্য থেকে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কালবিলম্ব না করে অধিরথ ঝাঁপ দিলেন গঙ্গার জলে। সাঁতারে গিয়ে ধরে ঘাটে নিয়ে এলেন সেই পেটিকা। দুজনে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন পেটিকার মধ্যে শুয়ে আছে কবচকুণ্ডলধারী এক দিব্য দেবশিশু। এই শিশু বিধাতার দান ভেবে নিঃসন্তান দম্পতি তাকে বুকে তুলে নিয়ে ফিরে এলেন আপন গৃহে। সেইদিন থেকে কুন্তীপুত্র কর্ণের পরিচয় হলো নীচকুল জাত রাধানন্দন রাধেয় রূপে। বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কবচকুণ্ডল রূপ মহাসম্পদ নিয়ে জন্মেছে বলে শিশুর নামকরণ করলেন বসুসেন।

এদিকে কুমারীমাতা কুন্তীর আনন্দ আশৌচের একবিংশ দিনের একের পর এক দিন অতিবাহিত হচ্ছে। প্রত্যহ প্রাতস্নান করে কুন্তী প্রাসাদশীর্ষে এক নিভৃত স্থানে উদীয়মান সূর্যের দিকে বসে দীর্ঘক্ষণ সূর্যের স্তব, আরাধনা করেন। নিমিলিত নয়না কুন্তী প্রত্যক্ষ করেন সেই কবচ কুণ্ডলধারী দেবদিবাকরের দীপ্ত মূর্তি। মুনি প্রদত্ত মন্ত্র পরীক্ষার জন্য কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠান্তে সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন। সহসা আবির্ভূত হয়ে সূর্যদেব বলেছিলেন—

সহসা কারও পদধ্বনিতে কুন্তীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন সেই ধাত্রী। কুন্তী দ্রুত তার কাছে গিয়ে বললেন—কোনো সংবাদ আছে?

ধাত্রী চারদিক তাকিয়ে নীচুস্বরে বলল—

—হ্যাঁ, শোন। আমার ভগ্নী আর ভগ্নীপতি কুরুরাজ্যের চম্পাপুরীতে থাকে। গতকাল সে আমাদের বাড়িতে এসেছে। তার কাছে শুনলাম কয়েকদিন আগে চম্পাপুরীর গঙ্গার ঘাটের নিকট দিয়ে স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল এক তাম্রপেটিকা তার মধ্যে শোনা যাচ্ছিল এক সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন। চম্পাপুরীর অধিরথ নামে এক সুত সাঁতারে সেই পেটিকাটি তীরে নিয়ে আসে এবং তার মধ্য থেকে পুত্রটিকে উদ্ধার করে। অধিরথ এবং তার স্ত্রী রাধা নিঃসন্তান, তারা বর্তমানে পুত্রটিকে আপন সন্তানবৎ লালন পালন করছে।

পুত্রের কুশল সংবাদে কুন্তী অত্যন্ত হর্ষান্বিত হয়ে আপন কণ্ঠমালা সেই ধাত্রীর গলায় পরিয়ে দিল। বলল—তোমার সেই আত্মীয়কে বলবে যেন প্রতিনিয়ত কর্ণের সংবাদ তোমার কাছে প্রেরণ করে তাকে যথোচিত পারিতোষিক দেওয়া হবে।

—কর্ণ নয়, চম্পাপুরীর অধিবাসীরা তোমার পুত্রের নাম রেখেছে বসুসেন।

—হোক, আমার পুত্র জগতে কর্ণ নামে পিতার ন্যায় যশস্বী হবে।

* * * * * *

সূত অধিরথের পুত্ররূপে কর্ণ ক্রমে বড়ো হচ্ছে। জনসমক্ষে রাধার পুত্র রাধেয় নামে সে পরিচিত। অতি শৈশব থেকে কর্ণের দেবোপম দেহকান্তি সকলকে আকৃষ্ট করতো। তার শক্তি ও সাহস ছিল অতুলনীয়। সমবয়সিরা এমনকী বয়স্করাও তাকে সমীহ করতো। অধীরথ হস্তিনাপুর থেকে একটি ছোটো ধনুক আর তির এনে দিয়েছিল বসুসেনকে। নিয়মিত লক্ষ্যভেদের অভ্যাস করে সে, অব্যর্থ তার লক্ষ্য। হস্তিনাপুরের প্রাসাদে একশো পাঁচ রাজপুত্র সবাই প্রায় কর্ণের সমবয়সি। গুরু দ্রোণাচার্য এসেছেন তাদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য। রাজকীয় গুরুকুলে আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্যও এসেছেন গুরুরূপে। দ্রোণাচার্যের পুত্র বালক অশ্বত্থামাও এই বালকদের সঙ্গে ধনুর্বেদ চর্চা করে। অধিরথের ইচ্ছা, তার পুত্র বসুসেনও দ্রোণাচার্য কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করুক। হস্তিনাপুরের রাজপ্রসাদের দীর্ঘদিনের সারথী অধিরথ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু সকলের রথ চালিয়েছে। বিশাল এই প্রাসাদের প্রায় সবার সঙ্গে পরিচয় আছে অধিরথের। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রীতিভাজন সে, ভীষ্মও তাকে স্নেহ করেন। একদিন সুযোগ বুঝে ভীষ্মকে বসুসেনের কথা বলল অধিরথ। তার ইচ্ছা বসুসেনকে ধনুর্বেদ শিক্ষার জন্য আচার্য দ্রোণের কাছে সমর্পণ করা। ভীষ্ম বসুসেনকে হস্তিনায়

নিয়ে আসতে বললেন। পরদিন উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে পিতার সঙ্গে হস্তিনাপুর প্রাসাদে এল কর্ণ বসুসেন, যেন এক দেবশিশু। একে একে প্রণাম করল ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে। অন্তপুর থেকে কুন্তী দেখলেন কবচকুণ্ডলধারী বালককে। দেখেই চিনতে পারেলেন, বুকের ভিতর মোচর দিয়ে উঠল, ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে বালককে বুকে তুলে নিয়ে তার মস্তকে চুম্বন করে। কিন্তু এক অজানা আতঙ্ক তাকে বাধা দিল। বসুসেনকে দেখে এবং তার কথাশুনে প্রীত হলেন ভীষ্ম। তিনি আচার্য দ্রোণের কাছে প্রস্তাব করলেন এই বালকের অস্ত্রশিক্ষার ভার নিতে। দ্রোণ দেখলেন বালককে। জহুরির চোখে পর্যবেক্ষণ করলেন এ কোনো সাধারণ বালক নয়। বসুসেনের বীরোচিত আচরণে প্রীত হয়ে আচার্য দ্রোণ তাকে ধনুর্বেদ পারদর্শী করে তোলার দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন। কৃপাচার্যও তাঁর সঙ্গে সহমত হলেন। গুরুকুলের অন্যান্য বিদ্যার্থীদের সঙ্গে এই নবাগত বালকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। এই নবীন সতীর্থকে পেয়ে সব বালকেরা প্রীত হলো। তবে কর্ণ আবাসিক নয়, অনাবাসিক হিসেবে গুরুকুলে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করবে। অধিরথ বললেন কোনো সমস্যা নেই।

—প্রাসাদের নিকটস্থ সূতপল্লীতে আমার একটি কুটির আছে। রাধেয় আমার সঙ্গে সেখানেই থাকবে। পিতা-মাতার আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হলো কর্ণের অস্ত্র প্রশিক্ষণ। স্মিতহাস্য সদাচারী বসুসেনের সঙ্গে অন্যান্য সতীর্থদের অল্প দিনের মধ্যেই সখ্য গড়ে উঠল। নিরলস অধ্যাবসায়ী বসুসেন অচিরেই আচার্যগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এতদিন ধনুর্বিদ্যায় অর্জুন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এবার কর্ণের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো। দুজনেই সমান সমান।

হস্তিনাপুরের এই রাজকীয় গুরুকুলে একশো পাঁচ জন বিদ্যার্থী ছিল। কর্ণকে নিয়ে একশো ছয় হলো। বিদ্যার্থীদের আবার দুটি দল একটি একশো ভাই কৌরবদের, অন্যটি পাঁচভাই পাণ্ডবদের। কৌরব দলের নেতা দুর্যোধন আর পাণ্ডবদলের নেতা ভীমসেন। সদাচারী সদালাপী পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সর্বদা কর্ণের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করে। অপরদিকে কৌরব দুর্যোধন বসুসেন কর্ণকে সবসময় নিজেদের দলে রাখার চেষ্টা করে। যেমন করে দ্রোণপুত্র অহংকারী নিষ্ঠুর অশ্বত্থামাকে নিজেদের দলে টেনেছে। তবে কর্ণ অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের বিশেষ অনুরাগী। কুচক্রী বালক দুর্যোধন কর্ণ-যুধিষ্ঠিরের এই সখ্য পছন্দ করে না। সে সর্বদাই কর্ণকে কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। ক্রমে ক্রমে দেশ দেশান্তর থেকে রাজকুমারেরা অস্ত্র শিক্ষার্থে হস্তিনাপুরে দ্রোণের ধনুর্বেদ শিক্ষার গুরুকুলে আসতে থাকে। বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ততদিনে কর্ণকে দুর্যোধন সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নিয়েছে। কুরু-পাণ্ডবের কদাপি বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হলে কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করে এবং বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। দুর্যোধনের প্ররোচনায় কর্ণ পাণ্ডবদের নানা প্রকার অবমাননা করতে থাকে। তথাপি সমাগত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তরুণ অর্জুন বাহুবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্বেদ শিক্ষায় প্রায় গুরু দ্রোণের সমকক্ষ হয়ে উঠলেন। প্রতিদিন বিদ্যারম্ভের আগে সারাদিনের ব্যবহারের জন্য বিদ্যার্থীদের গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসতে হতো। আচার্য দ্রোণ প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে এক একটি অতি ক্ষুদ্রমুখ কলসী দিলেন যাতে জল ভর্তি হতে অনেক সময় লেগে যায়। কেবল নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে এক বৃহৎমুখ কলসী দিলেন যা অতি দ্রুত পূর্ণ হয়ে যায়। এই কলসীতে জল ভর্তি করে অশ্বত্থামা দ্রুত গুরুকুলে ফিরে আসে; অন্যান্য বিদ্যার্থীরা তখনও গঙ্গায় জল ভরছে। এই অবসরে আচার্য দ্রোণ অশ্বত্থামাকে বিশেষ বিশেষ গূঢ় অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। এই ঘটনা অর্জুনের দৃষ্টিগোচর হলে অর্জুন বরুণাস্ত্রে কলসী ভর্তি করে গুরুর কাছে ফিরে আসতেন, অর্জুনের এই হঠকারিতায় গুরু দ্রোণ ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং প্রীত হয়ে অশ্বত্থামার সঙ্গে গূঢ় যুদ্ধপদ্ধতি এবং অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। এই পর্যায়ে চক্রব্যূহের মতো অতি গূঢ় সৈন্য সজ্জার মতো ক্ষত্রিয়দের পক্ষে দুর্লভ বিদ্যাও অর্জুন আয়ত্ত করেছেন। তৃতীয় পাণ্ডবের প্রতি গুরুর এমন পক্ষপাতিত্বে কর্ণ প্রচণ্ড ঈর্ষান্বিত।

এক রাতে অর্জুন ভোজন করছেন, সামনে একটি দীপশিখা প্রজ্বলিত। হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহে দীপটি নির্বাপিত হলো। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অন্নসহ অর্জুনের হাত ঠিক মুখেই চলে যাচ্ছে। অর্জুন মনে মনে ভাবলেন যা অভ্যাস করা যায় তাই শক্তিশালী হয়ে উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করে রাত্রিকালে ধনুর্বেদ অনুশীলনের জন্য শরাসনে জ্যা রোপণ করে বারংবার টংকার দিতে লাগলেন। সেই টংকার ধ্বনি শ্রবণ করে বিস্মিত দ্রোণ সহসা সেখানে এসে অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন—

—বৎস! সত্যিকথা বলছি, এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্ধর যাতে প্রখ্যাত না হয়, এইরূপ বিধান করব।

অন্তরাল থেকে এই ঘটনাটি আরও একজন প্রত্যক্ষ করলেন। ধনুকের টংকারে তারও নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি গুরু দ্রোণকে অনুসরণ করে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে বৃক্ষান্তরালে থেকে সমস্ত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন, তিনি কর্ণ। ক্রমে দ্রোণাচার্য অর্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরূঢ় এবং ভুতলে অবতীর্ণ হয়ে কীরূপে যুদ্ধ করতে হয় পুনর্বার সবিশেষ শিক্ষাদান করতে লাগলেন। গদাযুদ্ধ, অসিচর্যা, তোমার প্রয়াস ও শক্তি প্রয়োগ এবং সঙ্কীর্ণ যুদ্ধের কৌশল শেখালেন।

দ্রোণাচার্যের অসামান্য যুদ্ধনৈপুণ্য শ্রবণ করে ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে অগণিত রাজা ও রাজকুমার ধনুর্বেদ শিক্ষার জন্য হস্তিনায় আসতে থাকেন। এই সময়ে একদিন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণ সন্নিধানে সমাগত হলো; কিন্তু

সে বন্যজাতি, সমাগত রাজা ও রাজকুমারদের সমতুল্য ও সতীর্থ নয়, সে অবাঞ্ছিত অপাঙ্‌ক্তেয়, এই বিবেচনা করে আচার্য দ্রোণ তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন না। তখন আশাহত, বিষাদগ্রস্ত নিষাদ রাজকুমার ভক্তিভরে দ্রোণের পাদবন্দনা করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। সেখানে এক পর্ণকুটীর নির্মাণ করে তারমধ্যে আচার্য দ্রোণের সহস্ত নির্মিত এক মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করে, তাঁকে গুরুরূপে অভিষিক্ত করে ব্রতধারণ পূর্বক অস্ত্রবিদ্যা আরম্ভ করল। অচিরেই সে অস্ত্রের প্রয়োগ, সন্ধান ও সংহার বিষয়ে সবিশেষ কৃতকার্য হয়ে উঠল। তবু তার অভ্যাসের বিরাম নেই।

একসময় আচার্য দ্রোণের আদেশে কৌরব ও পাণ্ডবেরা মৃগয়ার্থে রথারোহণে অরণ্যে গমন করে। যেহেতু এটি শুধুমাত্র হস্তিনাপুর রাজকুমারদের জন্য নির্দিষ্ট মৃগয়া, তাই দুর্যোধনের অনুরোধ সত্ত্বেও আচার্য দ্রোণ কর্ণকে এই মৃগয়ায় অংশগ্রহণে অনুমোদন করেননি। শিকারের সহযোগী কুকুর, বাগুরা ইত্যাদি নিয়ে কয়েকজন তাদের অনুগমন করল। অরণ্যে প্রবেশ করে কৌরব ও পাণ্ডবেরা যখন শিকারের সন্ধানে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন তখন সেই শিকারি কুকুর মৃগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদরাজ তনয়ের সান্নিধানে সমুপস্থিত হলো। সেই কুকুর মলিন-কলেবর কৃষ্ণাজিন–জটাধারী নিষাদরাজ কুমার একলব্যকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগল। কুকুরের চীৎকারে অস্ত্রাভ্যাসে বিঘ্ন ঘটায় একলব্য এক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে তার মুখ বন্ধ করে দিল। ভীত কুকুরটি দ্রুত সেই স্থান পরিত্যাগ করে পাণ্ডবদের কাছে চলে গেল। পাণ্ডবেরা কুকুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সেই শর নিরীক্ষণ করে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং সেই শরের লঘুত্ব ও শব্দভেদিত্ব দর্শনে সকলেই নিজেদের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টবোধে লজ্জিত হয়ে প্রয়োগকর্তার প্রশংসা করতে লাগলেন। পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে অনুসন্ধান করে পরিশেষে বনবাসী এক মলিন, জটাধারী, কৃষ্ণাজিন পরিহিত যুবককে নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণ করতে দেখলেন। পাণ্ডবেরা এই বিকৃতদর্শন পুরুষকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—

—হে বীরবর! তুমি কে? কার পুত্র?

—আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য, আচার্য দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্বেদ অনুশীলন করছি। পাণ্ডবেরা মৃগয়া শেষে রাজধানীতে ফেরার পর দ্রোণ সন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করলেন। অতঃপর কুন্তীপুত্র অর্জুন এক নির্জন স্থানে বিনীতবচনে আচার্য দ্রোণকে বললেন—গুরুদেব! আপনি অঙ্গীকার করেছিলেন আমার অপেক্ষা আপনার কোনো শিষ্যই উৎকৃষ্ট হবে না, কিন্তু এক্ষণে তার অন্যথা দেখা যাচ্ছে। নিষাদাধিপতির পুত্র একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্বেদে আমা অপেক্ষাও সমাধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে।

অর্জুনের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করে আচার্য দ্রোণ মুহূর্তকাল চিন্তা করে এর বিশেষ কারণ কিছুই অনুধাবন করতে পারলেন না। পরিশেষে একদা অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যপ্রদেশে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, জটাচীরধারী, মলিন-কলেবর, নিষাদ রাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করে বারংবার বাণ বর্ষণ করে চলেছে। এই অবসরে আচার্য দ্রোণ তার সম্মুখীন হলেন। একলব্য সহসা সম্মুখে আচার্যকে দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলো। তাঁর পদবন্দনা পূর্বক আসনে উপবেশন করিয়ে আচার্যের সামনে তাঁর আত্মপরিচয় দিয়ে যথোচিত পূজা করল এবং গুরুর আশীর্বাদের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর সামনে দণ্ডায়মান হলো। আচার্য দ্রোণ বললেন—হে বীর! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হয়ে থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।

একলব্য আনন্দের সঙ্গে বলল—ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই। আদেশ করুন আমার সামর্থের মধ্যে কোন দক্ষিণায় আপনাকে তুষ্ট করব?

—হে বীর! যদি তুমি সম্মত থাক তবে তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে প্রদান কর।

সত্যবাক্ একলব্য গুরু দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে প্রফুল্লমনে হাসিমুখে স্বহস্তে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করল।

অর্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করে অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হলেন। তখন তাঁর অপকর্ম বিষয়কে আশঙ্কা তিরোহিত হলো; এই ধরাধামে অর্জুনকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না; দ্রোণাচার্যের এই অঙ্গীকার বাক্যও রক্ষিত হলো। দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা এবং রাধেয় কর্ণ বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জুনের প্রতি নিতান্ত ঈর্ষাপরায়ণ হলো।

আচার্য দ্রোণ শিষ্য কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষায় অগ্রগতি পরীক্ষার জন্য গোপনে শিল্পীদ্বারা একটি পক্ষী নির্মাণ করিয়ে সেটিকে একটি গাছের উঁচুডালে স্থাপন করলেন। তারপর পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে শরাসন সহ প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তিনি আহ্বান করনেল যুধিষ্ঠিরকে। বললেন—

—হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি শরসন্ধান করে আমার নির্দেশ অনুসারে বাণ নিক্ষেপ কর।

যুধিষ্ঠির আচার্যের নির্দেশ অনুসারে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে শরাসন নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। দ্রোণ বললেন—

—তুমি লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির কর। যুধিষ্ঠির বললেন—

—গুরুদেব আমি তাই করছি।

দ্রোণ বললেন—

—তুমি এক্ষণে পাখি ছাড়া আর কী দেখছ?

—আমি এক্ষণে পাখি, বৃক্ষ, আপনি এবং আমার ভ্রাতৃগণকে দেখতে পাচ্ছি।

তখন দ্রোণ অপ্রসন্ন হয়ে বললেন—

—তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারবে না, এস্থান থেকে অপসৃত হও।

এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে আচার্য দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্যায়ক্রমে একই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তাঁর অভিপ্রেত উত্তর দিতে পারলেন না বলে সবাই তিরস্কৃত হলেন। এবার গুরু লক্ষ্যভেদের জন্য অর্জুনকে আহ্বান করলেন। অর্জুন শরাসন সহ উপস্থিত হলে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন—

—তুমি এখন কী দেখছ?

—আমি এখন শুধুমাত্র পাখিটিকে দেখছি।

—সম্পূর্ণ পাখিটিকে দেখছ?

—না, এখন শুধুমাত্র পাখিটির চক্ষু আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

—বৎস তবে লক্ষ্যভেদ কর।

আদেশ পাওয়া মাত্র অর্জুন তির নিক্ষেপ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে সেই পাখির চক্ষু বিদ্ধ হলো। আচার্য দ্রোণ আনন্দে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন।

কিছদিন পরের ঘটনা। একদিন আচার্য দ্রোণ সমস্ত শিষ্যকে নিয়ে স্নানের উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে গমন করলেন। উপস্থিত সকলে যখন গঙ্গায় অবগাহন করছেন তখন এক বিশালাকৃতি কুমির আচার্য দ্রোণের কটিদেশ কামড়ে তাঁকে গভীর জলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি আপন শক্তিতে কুমিরের মুখ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে শিষ্যদের পরীক্ষার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আবেদন জানালেন—বৎসগণ! তোমরা এই কুমির বিনাশ করে আমার প্রাণ রক্ষা কর।

তাঁর আহ্বান শুনে সকল রাজকুমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্ব-স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাকল। অর্জুন তখন তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্নিবার ও খরধার পঞ্চবাণে কুমিরকে সংহার করে গুরুকে উদ্ধার করলেন। অর্জুনের এই কৃতকার্যতায় আচার্য দ্রোণ অতিশয় প্রীত হলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাঁকেই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করলেন।

এইভাবে কৌরব ও পাণ্ডবেরা আচার্য দ্রোণের কঠোর তত্ত্বাবধানে অস্ত্রবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলেন। আবার এক-একজন এক-এক বিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম। যেমন যুধিষ্ঠির মহারথী, দুর্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধে বিশেষ পারঙ্গম, অর্জুন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, বিকর্ণ, নকুল ও সহদেব অসিচর্চায় অত্যন্ত কুশলী। এইসময়ে একদিন রাজসভায় যেখানে ব্যাস, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, সোমদত্ত, বাহলীক ও বিদুরের উপস্থিতিতে আচার্য দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—

—মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্বেদে কৃতবিদ্য হয়েছেন। আপনি অনুমতি দিলে তারা আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দিতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ! আপনি আমাদের বংশের হিতার্থে এক মহৎ কার্য সম্পাদন করলেন। এখন আপনি আদেশ করলেই আপনার শিষ্যদের প্রকাশ্যে অস্ত্র পরীক্ষা হবে। আপনি যেরূপ নির্দেশ করবেন সেরূপ রঙ্গভূমি নির্মিত হবে। আমি অন্ধ, তথাপি কুমারেরা যে সকল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করবে, আমি তাঁদের সান্নিধ্য লাভের একান্ত অভিলাষ করি।

বিদুরকে আচার্য দ্রোণের সঙ্গে পরামর্শ করে রঙ্গভূমি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হলো। হস্তিনাপুরীর প্রান্ত ভাগে বিশাল রঙ্গভূমি নির্মিত হলো। রাজপুরুষদের জন্য, অন্তঃপুরিকাদের জন্য এবং চতুর্বর্ণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শনাগার নির্মিত হলো।

নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্বর্ণ লোক রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দশনার্থী হয়ে রাজধানী থেকে দ্রুত রঙ্গস্থলে আগমন করতে লাগলেন। যথাসময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে ভীষ্ম ও কৃপাচার্যকে অগ্রে রেখে রাজপুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট মহার্ঘ আসনে এসে উপবেশন করলেন। অন্তঃপুর থেকে শিবিকারোহণে গান্ধারী, কুন্তী, পরাশরী প্রভৃতি পুররমণীরা রঙ্গস্থলের মুক্তাজালবষ্টিত নির্দিষ্ট স্থানের আসনে এসে উপবেশন করলেন। তখন শুক্লাম্বরধারী, শুক্লশ্মশ্রু-শুক্লকেশ, শুক্লমাল্য পরিহিত আচার্য দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে উন্নতশিরে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বলি-প্রদানপূর্বক শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করালেন। পুণ্যকর্ম সমাধান হলে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র বহন করে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করল। এইবার আচার্য দ্রোণ রাজকুমারদের রঙ্গস্থলে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন, রণসাজে সজ্জিত রাজকুমারেরা সর্বজ্যেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে রেখে সশস্ত্র হয়ে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠক্রমে রঙ্গাস্থলে প্রবেশ করলেন। আচার্য দ্রোণের নির্দেশক্রমে অস্ত্রপরীক্ষা শুরু হলো। কৃপাচার্য আসন ত্যাগ করে রঙ্গস্থলে এসে যথাবিধি শস্ত্রপরীক্ষা পরিচালনা করতে লাগলেন। রাজকুমারেরা তখন অত্যাশ্চর্য অস্ত্রসমুদয় নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বেগবান রথে আরোহণ করে স্বনামাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ করলেন। অসি-চর্ম গ্রহণ পূর্বক কখনও গজে কখনও-বা অশ্বে অধিরূঢ় হয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। একমাত্র অসিদ্বারা কৌশলক্রমে নানা অস্ত্র নিবারণ করলেন। এইরূপ অসিচর্চায় রাজকুমারগণের অসিযুদ্ধে দক্ষতা ও নির্ভীকতা প্রকাশ পেল। তাঁদের হস্তমুষ্টি থেকে অসি একবারও স্খলিত হয়নি। অনন্তর মহবলপরাক্রান্ত দুর্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর হয়ে গদাহস্তে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ

হলেন। দুর্যোধন ও ভীমসেন উভয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দণ্ডায়মান হলো। উভয়ের সমর্থনে দর্শকদের মধ্যে মহা কোলাহল শুরু হলো। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না। অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন বন্ধ হবার উপক্রম হলো। তখন আচার্য দ্রোণ আত্মজ অশ্বত্থামাকে সংগ্রামে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। গুরুর নির্দেশক্রমে ব্যর্থমনোরথ দুই বীর রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করলেন। এইবার আচার্য দ্রোণ প্রিয় শিষ্য সব্যসাচী অর্জুনকে রঙ্গস্থলে আহ্বান করলেন। আচার্য দ্রোণ রঙ্গস্থলে বললেন—

—শিষ্য অর্জুন আমার পুত্রের থেকেও প্রিয়তর। সর্বশাস্ত্র বিশারদ, উপেন্দ্র তুল্য মহাবীর। উপস্থিত দর্শকগণ আপনারা এই মহাতেজার অস্ত্রবিদ্যা নৈপুণ্য দর্শন করুন।

অনন্তর জনতার কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থলের লোকসকল শান্ত হলে, মহাবীর অর্জুন আচার্য দ্রোণের ইঙ্গিতে নিজের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করতে লাগলেন। প্রথমে অগ্নিবাণ প্রয়োগে অগ্নিসৃষ্টি করে সেই অগ্নি প্রশমিত করলেন বারুণবাণের জলধারায়। বায়বাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করে পর্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করলেন। অন্তর্ধনাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হলেন। অতঃপর শিক্ষাকৌশলে কখনও দীর্ঘ, কখনও হ্রস্ব, কখনো রথসম্মুখে, কখনও রথমধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন এবং অবিলম্বে ভূতলে অবতীর্ণ হলেন।

এইরূপ অদ্ভুত অস্ত্র প্রয়োগ দর্শনে দর্শককুল প্রথমে বাক্‌রুদ্ধ এবং পরে হর্ষধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। শত ভ্রাতা বেষ্টিত দুর্যোধন ও কর্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। সমবেত দর্শকদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা আর প্রশংসা নিয়ে নতমস্তকে সকলকে অভিবাদন করে অর্জুন উন্নতশিরে রঙ্গস্থল ত্যাগ করলেন।

* * * * * *

অর্জুনের অলৌকিক অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর বিস্ময়ভাব তখনো কাটেনি, এই সময়ে দুর্যোধনাদির প্রবল উৎসাহে সেই সুদৃশ্য রঙ্গস্থলে নভোমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় প্রবেশ করলেন মহাবীর কর্ণ। তাঁর মুখমণ্ডল সহজাত কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত, তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে অসিবন্ধন করে পদচারী পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। দীপ্ত, কান্তি ও দ্যুতিদ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তি সমূহের বল একাকী ধারণ করতেন। তিনি রঙ্গস্থল ইতস্তত অবলোকন করে নিয়ম রক্ষার জন্য আচার্য দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম জানালেন। স্পষ্টত এতে ভক্তি ছিল না।

রঙ্গস্থলে উপস্থিত জনতা তখন তাঁর সবিশেষ পরিচয় জানার জন্য উদ্‌গ্রীব। তখন সূর্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত ভ্রাতা কুন্তীতনয় অর্জুনকে জলধরগম্ভীর স্বরে বললেন—

—হে পার্থ! তুমি যেরূপ অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করেছ, সর্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করছি, তুমি বিস্মিত হবে না।

কর্ণের এই দাম্ভিক বাক্য শ্রবণে চারদিক থেকে দর্শকেরা উৎসাহ ব্যাঞ্জক ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। জনতার এই উৎসাহকে কর্ণ-দুর্যোধনের প্রীতি এবং অর্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক করল। অতঃপর আচার্য দ্রোণের নির্দেশ অনুসারে সংগ্রামপ্রিয় কর্ণ, অর্জুন যেসব বিদ্যা প্রদর্শন করেছিলেন কর্ণও অবিকল সেই সেই বিদ্যা প্রদর্শন করলেন। তখন দুর্যোধন ভ্রাতৃগণ সহ কর্ণকে আলিঙ্গন করে সাদরে বললেন—

—হে মহাবাহু! আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এই রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়ে আপন পরাক্রম দেখালে। এক্ষণে এই কুরুরাজ্যকে আপনার ভেবে উপভোগ কর।

—হে বন্ধু! বোধহয় আমার কর্তব্য আমি সমাধা করেছি। এই মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে সখ্য এবং অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে বাসনা করি।

দুর্যোধন কর্ণের বাক্যে অতিশয় প্রীত হয়ে বললেন—

—উত্তম, এক্ষণে আমার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বিষয়ভোগবাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষদলের মস্তকে পদার্পণ করে পরমসুখে কালাতিপাত কর।

দুর্যোধনের এইরূপ প্ররোচনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুন বললেন—রে কর্ণ! যারা অনাহূত হয়ে উপদেশ প্রদান করে এবং বাক্যালাপ করে তারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করে সেখানে প্রেরণ করব।

অর্জুনের ঈদৃশ স্পর্ধায় কর্ণের পৌরুষ দীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হলো, প্রকাশ্যে বললেন—

—হে অর্জুন। দেখ, এই রঙ্গস্থল সর্বসাধারণের, এখানে তোমার কোনো প্রভুত্ব নেই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করে থাকেন। বেশি কথায় কাজ কী, যতক্ষণ গুরুজন সমক্ষে শরদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করছি, তক্ষণ আর বিফলশরক্ষেপের আবশ্যকতা নেই।

কর্ণ-অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনিবার্য উপলব্ধি করে আচার্য দ্রোণ অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ দিলেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ কুশলী কৃপাচার্যকে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। দুইবীর মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মল্লভূমে আবির্ভূত হলেন। অলক্ষ্য থেকে দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্যদেব আপন আপন আত্মজদের সহায়তা করলেন। কর্ণের পক্ষে ধৃতরাষ্ট্ররা এবং অর্জুনের পক্ষে আচার্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, এমনকী দুর্যোধনের অনুজ তরুণ বিকর্ণও অবস্থান করতে লাগলেন। রঙ্গস্থলের সমস্ত দর্শক এমনকী অন্তঃপুরিকারাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক-এক পক্ষে পক্ষপাত করতে লাগলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করে কুন্তী মূর্চ্ছিতা হলেন। সর্বধর্মবেত্তা বিদুর তাঁকে মূর্চ্ছিতা দেখে পরিচারিকাদের সুশীতল জলসিঞ্চনদ্বারা পরিচর্যা করার আদেশ দিয়ে কুন্তীকে আশ্বস্ত করলেন। কুন্তী সংজ্ঞালাভ করে পুত্রদ্বয়কে দর্শন করে কিংকর্তব্য বিমূঢ় এবং অত্যন্ত সন্ত্রস্তা হলেন। তখন আচার্য কৃপ উভয় যুদ্ধার্থীকে ধনুর্ধারণ করতে দেখে কর্ণকে বললেন—

—কুন্তীগর্ভসম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবেন। হে মহাবাহু। এক্ষণে তুমি তোমার মাতা ও পিতার নাম উল্লেখ কর এবং কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেছ আর কোন্ রাজবংশে তাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হলে অর্জুন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, নচেৎ তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে না। কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীলদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না।

কৃপাচার্যের এই বাক্যশ্রবণে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন। তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল, তিনি বাক্‌রহিত হলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বৃষ্টিজল নিক্ষিপ্ত সুকোমল পদ্মের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। কর্ণের এমন অবস্থা দেখে দুর্যোধন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আচার্য দ্রোণের প্রতি বিনীতভাবে বললেন—

—আচার্যদেব, শাস্ত্র বলে যিনি সৎকুলে সমুদ্ভূত, বীর ও সৈন্যচালনায় সমর্থ, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। তথাপি যদি অর্জুন রাজা কিংবা রাজকুল বংশোদ্ভূত ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হন, তবে আমি এই মুহূর্তে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করছি। রাজা হলে নিশ্চয় অর্জুনের কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে আপত্তি থাকবে না।

দুর্যোধনের আদেশে সেবকরা তৎক্ষণাৎ রঙ্গস্থলে অভিষেকের আয়োজন করে ফেলল। অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগৃহীত হলো। এলেন শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ। বেদ ধ্বনিতে মুহূর্তের মধ্যে মুখরিত হলো রঙ্গস্থল। রত্নসিংহাসনে আসীন কর্ণকে আতপ তণ্ডুল, চন্দন, কুসুম ও সুবর্ণদ্বারা শাস্ত্রমতে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করা হলো। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হলে তাঁর শিরোপরি রাজছত্র ধৃত হলো, উভয় পাশে চামর-বীজন এবং কৌরবগণের অনুসারীরা জয়ধ্বনি করতে লাগল। তখন অঙ্গরাজ কর্ণ দুর্যোধনকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক বললেন—

—মহারাজ! তুমি আমাকে রাজ্যদান করে কৃতকৃতার্থ করেছ। এই মুহূর্তে তোমাকে প্রতিদান হিসাবে আমি কী দিতে পারি?

দুর্যোধন অত্যন্ত প্রীতি হয়ে বললেন—মহারাজ কর্ণ, আপাতত তোমার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা ছাড়া আমার অন্য কোনো বাসনা নেই। সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তুমি সদাসর্বদা আমার পাশে থেকো।

—তাই হবে সখা, তোমার আমার কখনো বিচ্ছেদ হবে না।

অতঃপর উভয়ে সহর্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

তাৎক্ষণিকভাবে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করা এবং কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের সখ্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রমুখ ভালোভাবে নেননি। তাঁরা এতে দুর্যোধনের কুঅভিসন্ধির আভাস পেয়েছিলেন। পাণ্ডবরাও এই সখ্য ভালো চোখে দেখেনি। তবে অন্যান্যেরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করলেও ভীমসেন চুপচাপ থাকার পাত্র ছিলেন না। ঠিক এই সময়ে পুত্রের অঙ্গরাজ্যে অভিষেকের সংবাদ পেয়ে অতি দ্রুত ঘর্মাক্ত কলেবরে রঙ্গস্থলে এসে প্রবেশ করলেন সূত অধিরথ। পিতাকে দেখামাত্র পুত্র কর্ণ নতজানু হয়ে পিতার চরণ স্পর্শ করে চরণধূলি মস্তকে ধারণ করলেন। রঙ্গস্থলে উপস্থিত হস্তিনানগরের সাধারণ মানুষ কর্ণের মহানুভবতা ও কর্তব্যপরায়ণায় ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। আবার এই দৃশ্য দেখে কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করে ভীমসেন অত্যন্ত অবজ্ঞার স্বরে কর্ণকে বলতে লাগলেন—

—রে সূতপুত্র! রণে অর্জুনের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করা তোর পক্ষে কোনোমতেই শ্রেয়স্কর নয়। বরং আপন বংশোচিত রথের অশ্ববল্গা ধারণই তোর যোগ্য কর্ম। রে নরাধম! অগ্নি সন্নিহিত যজ্ঞীয় ঘৃত অবলেহনে যেমন কুকুরের অধিকার নেই, তেমন অঙ্গরাজ্য উপভোগেও তোর অধিকার নেই।

ভীমের এইরূপ উদ্ধত বাক্যে কর্ণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হলেন, তাঁর অধর কম্পিত হতে লাগল, তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যদেবকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। ভীমের এমন অপমানসূচক বাক্যে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে বললেন—

—হে ভীম! কর্ণের প্রতি এইরূপ বিদ্রূপ করা সমুচিত নয়। ক্ষত্রিয়দের বলই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করবেন। জন্মের নিরিখে বীরত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব নিরুপণ অনুচিত। এইরূপ বহু প্রমাণ আছে, কৃত্তিকার পুত্র কার্তিকেয় দেব সেনাপতি। গৌতমবংশে শরস্তম্ব থেকে গৌতম উৎপন্ন হয়েছেন। আমাদের গুরু আচার্য দ্রোণের জন্মও কুম্ভ থেকে। আর তোমাদের জন্ম কীভাবে হয়েছে তা কারও অগোচর নেই। অতএব জন্ম নয়, কর্মই প্রধান। সহজাত কবচকুণ্ডলধারী, সর্বসুলক্ষণ যুক্ত, সূর্যসঙ্কাশ, মহাবীর কর্ণ আজ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর। কর্ণ ইচ্ছা করলে আপন বাহুবলে এবং আমার সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করতে পারেন। কর্ণের এই রাজ্যলাভ বিষয়ে যদি কারও বিদ্বেষ থাকে তিনি কর্ণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে পারেন।

দুর্যোধনের এই ঘোষণায় রঙ্গস্থলে এক সঙ্গে হর্ষ ও বিষাদের ধ্বনি উত্থিত হলো। মহাবীর অর্জুন ক্ষিপ্ত হয়ে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে ধনুকে টঙ্কার দিয়ে বীরদর্পে দ্বন্দ্বভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। ঠিক এই সময়ে দিনমণি অস্তাচলে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো ধরণীতে। আচার্য কৃপ ঘোষণা করলেন, ধনুর্বেদের অনুশাসন অনুযায়ী সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ নিষিদ্ধ, তাই প্রতিযোগিতা শেষ। অন্তরাল থেকে এতক্ষণ যিনি দুই সন্তানের দ্বৈরথে আতঙ্কিত হয়ে প্রহর গুনছিলেন সেই জননী কুন্তী আশ্বস্ত হলেন। রঙ্গস্থলে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি কর্ণের, কোনো ব্যক্তি অর্জুনের পরাক্রমের প্রশংসা করতে করতে আপন আপন গৃহের দিকে অগ্রসর হলেন। কর্ণের সহায়তালাভ করে দুর্যোধনের অর্জুন-আতঙ্ক তিরোহিত হলো। মহাবলী কর্ণও দুর্যোধনকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করলেন।

দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের কাছে কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা শেষ। তথাপি কর্ণের মনে অতৃপ্তি, ধনুর্বেদের অনেক কিছু এখনো তাঁর অজানা। একজন মহারথীর সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র সেটি এখনো তাঁর কাছে অধরা। দ্রোণের গুরু পরশুরামের সহায়তা ছাড়া এই অস্ত্রলাভ অসম্ভব। কর্ণ উপস্থিত হলেন পরশুরামের কাছে। একদা ব্রাহ্মণ বিপ্লবের নায়কশ্রেষ্ঠ পরশুরাম, আপন হস্তে একুশবার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছেন। ত্রেতাযুগে পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের দর্পচূর্ণ করার জন্য তির নিক্ষেপ করে তাঁর স্বর্গ গমনের পথ চিরকালের মতো রুদ্ধ করে দিয়েছেন, তথাপি ব্রহ্মতেজে বলীয়ান পরশুরাম দ্বাপর যুগেও অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী। অস্ত্রগুরু পরশুরাম একমাত্র ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য কাউকে অস্ত্রশিক্ষা দেন না। তাই কর্ণকে নিতে হলো ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ। মুণ্ডিত মস্তক, শিখাধারী, গলায় যজ্ঞোপবীত, কপালে তিলক। সূর্যপুত্রের সহজাত তেজ ব্রহ্মতেজের মতোই জ্বাজ্জ্বল্যমান। আচার্য পরশুরামের সামনে গিয়ে প্রণিপাত করলেন কর্ণ। তাঁর দিব্যকান্তি দেখে ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে কোনো সংশয় রইলো না পরশুরামের। তিনি কর্ণকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে সম্মত হলেন। শুরু হলো কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে কর্ণ ধনুর্বেদে গুরুর কাছে আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। কর্ণের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা দেখে আচার্য পরশুরাম তাঁকে গূঢ় অস্ত্রবিদ্যাসমূহ শিক্ষা দিতে লাগলেন। কর্ণ তখন গুরু পরশুরামের নিত্যসঙ্গী। সর্বক্ষণ গুরুর অনুগমন করেন। একদা এক ঋষিকুমার বার্তা নিয়ে এল অরণ্যের উত্তর অংশের তপোবনের ঋষিরা রাক্ষসদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছেন। রাক্ষসদের অত্যাচরে তাঁদের যাগযজ্ঞ বিঘ্নিত। পরশুরামের নির্দেশে কর্ণ সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের বিনাশ করতে লাগলেন। অনেক রাক্ষস ভীত হয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করল। ঋষিদের যাগযজ্ঞ ও ধর্মাচরণ নির্বিঘ্ন

With Best Compliments from -

NITIN ENTERPRISES

Engineers & Die Castings

HAND TOOLS

D-138A, Phase-V, Focal Point, Ludhiana

M: 9814025239, 9814126239

(O) 0161-2676985

With Best Compliments from :-

M/s. Sant Steel Forgings Private Limited

G. T. Road Bye Pass
Jalandhar - 144012
Tel. 0181-2601719

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

হলো। উত্তর দিকের অরণ্যকে নিরুপদ্রপ করে ফিরে আসছেন সশিষ্য পরশুরাম। পথশ্রমে ক্লান্ত, এক বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন তিনি। তারপর কর্ণের উরুতে মস্তক স্থাপন করে পরশুরাম নিদ্রা গেলেন, গভীর নিদ্রা। দীর্ঘসময় অতিবাহিত হচ্ছে, এই সময়ে এক বজ্রকীট কর্ণের উরুতে দশংন করল। কর্ণের উরুদেশ থেকে রক্তধারা বইতে লাগল। পাছে গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে কর্ণ সেই বজ্রকীটের সুতীব্র দংশন জ্বালা আর রক্তপাত নীরবে সহ্য করতে লাগলেন।

নিদ্রাভঙ্গ হলে পরশুরাম রক্তাক্ত কর্ণকে দেখে বললেন—

—তুমি এই কীটের দংশন সহ্য করলে কেন?

—অধৈর্য হলে আপনার নিদ্রাভঙ্গ হতো, তাই নীরবে সহ্য করেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কর্ণের দিকে তাকালেন পরশুরাম। বললেন—

—তুমিতো ব্রাহ্মণ নও! সত্য করে বলো তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? এত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা তো ব্রাহ্মণের থাকে না, তুমি ব্রাহ্মণ কুমার নও! কে, তুমি সত্যি করে বল?—'ন ত্বং বিপ্রঃ কোহসি সত্যং বদেতি।'

নতমুখে কর্ণ বললেন—ভগবন! আমি সূতপুত্র রাধেয় কর্ণ। ব্রহ্মাস্ত্র লাভের জন্য নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

জ্বলন্ত অগ্নির মতো পরশুরাম কর্ণকে অভিশাপ দিলেন—মিথ্যা পরিচয়ে যে ব্রহ্মাস্ত্র তুমি আমার থেকে লাভ করেছ তা বিফল হবে। কার্যকালে এই বিদ্যা তুমি বিস্মৃত হবে—'ন কর্মকালে প্রতিভাশ্যতিত্মাম্।' (কর্ণপর্ব–৪২ অঃ)

কর্ণের শিরে বজ্রাঘাতের মতো গুরুর এই অভিশাপ বর্ষিত হলো। অভিশাপের পর্ব এখানে শেষ নয়, অস্ত্রচালনা সর্বদা সক্রিয় রাখার জন্য কর্ণ প্রায় অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতেন। একদিন অস্ত্র চালনা করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে অলক্ষ্যে এক ঋষির হোমধেনুকে তিরবিদ্ধ করেন। মৃত্যু হয় সেই হোমধেনুর। প্রিয় হোমধেনুর মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘাতক কর্ণকে অভিশাপ দিয়ে বললেন— রে পাষণ্ড! আমার প্রিয় হোমধেনুকে তুমি বধ করেছ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার জীবনের শেষ ঘোর যুদ্ধে মেদিনী তোমার রথচক্র গ্রাস করবে। —'শ্বভ্রেতে পততাং চক্রমিতি মাং বাহ্মনো—হব্রবীত।' (কর্ণপর্ব ৪২ অঃ)

গুরু পরশুরামের অভিশাপ, ব্রাহ্মণ বিজয়ের অভিশাপ। তথাপি কর্ণ অকুতভয়, অপরাজেয়। কর্ণ প্রজাবৎসল নৃপতি। তাঁর নিকট থেকে কোনো প্রার্থী কোনোদিন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়নি। দাতা কর্ণের খ্যাতি তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কর্ণ অকৃতদার, কেননা কোনো ক্ষত্রিয় রাজা সূতপুত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে রাজি নন। আবার কর্ণও কোনো হীন জাতির কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন না।

অঙ্গরাজ্যের রাজপ্রসাদ থেকে গঙ্গা বেশ খানিকটা দূর। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে এই দূরত্ব অতিক্রম করে কর্ণ রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করেন। স্নানান্তে দীর্ঘসময় জপ, তপ আর সূর্যবন্দনা। উদীয়মান সূর্যরশ্মি যেন কর্ণের সর্বাঙ্গে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয়। উদীয়মান সূযের দিকে তাকিয়ে কর্ণ দেখতে পান অতি আপন কাউকে। প্রভাত-সূর্যের অদর্শনে কর্ণ বিচলিত হয়ে পড়েন। এক ভোরে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। গাঢ় মেঘের অন্তরালে উদীয়মান সূর্যদেব। কর্ণ পবনাস্ত্রে মেঘ বিতারিত করে সূর্য দর্শন করলেন। স্নান সেরে যখন প্রাসাদে ফেরেন তখন সিংহদুয়ারে প্রার্থীদের ভিড়। তাদের নানা চাহিদা। হাসিমুখে রাজা তাঁদের সব চাহিদা পূরণ করেন। এভাবেই শুরু হয় রাজা কর্ণের দিন। কিন্তু হঠাৎ একদিন ছন্দ পতন হলো। সেদিনও কর্ণ গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছেন, হঠাৎ পথের পাশে এই এক কুটীর থেকে নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব থামিয়ে কুটীর অঙ্গনে উপস্থিত হলেন কর্ণ। অনুসন্ধান করে জানলেন এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধার একমাত্র কন্যা পদ্মাবতী। গতরাতে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। তার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। বর্তমানে পিতার সৎকার এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। রাজা তাকে আত্মপরিচয় দিয়ে ক্রন্দন থেকে বিরত করলেন। যথোচিতভাবে তার পিতার সৎকার করালেন। তার সেবার জন্য দাসী এবং রক্ষী নিয়োগ করলেন। যথাসময়ে সেই ক্ষত্রিয় যোদ্ধার পারলৌকিক কার্য সমাধান হলো। এবার কন্যার দিকে নজর দিলেন কর্ণ। অসাধারণ রূপবতী পদ্মাবতী, অত্যন্ত সুশীলা, রাজরানি হওয়ার যোগ্য কন্যা। এখন তার চিন্তা রাজানুকূল্যে আর কতদিন চলবে? কর্ণ একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন প্রাসাদে। রাজকীয় রথ পদ্মাবতীকে নিয়ে প্রবেশ করল অঙ্গ রাজপ্রাসাদে। পরিচারিকা তাকে নিয়ে গেল রাজসন্নিধানে, বসাল উত্তম আসনে। রাজা কর্ণ বিন্দুমাত্র ভনিতা না করে পদ্মাবতীকে বললেন তার আপত্তি না থাকলে কর্ণ তাকে বিবাহ করতে রাজি আছেন, তার ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করছে। লজ্জিতা পদ্মাবতী সবদ্বিধা দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে প্রণাম করে রাজা কর্ণের পদতলে পতিত হলেন।

অঙ্গরাজ্যের রানি হলেন পদ্মাবতী। কয়েকদিন উৎসবের জোয়ারে ভেসে গেল অঙ্গরাজ্য। হস্তিনাপুর থেকে দুর্যোধন পাঠালেন অনেক মহার্ঘ্য উপঢৌকন। শুদ্ধশীলা পদ্মাবতী হয়ে উঠলেন রাজা কর্ণের প্রকৃত সহধর্মিণী। স্বামীর দান ধ্যান ও অন্যান্য ধর্মে-কর্মে যথাযথ অংশগ্রহণ করেন পদ্মাবতী। যথাসময়ে এক সর্বসুলক্ষণ যুক্ত পুত্র প্রসব করেন পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণরা এই পুত্রের নামকরণ করেন বৃষসেন।

* * * * *

হস্তিনাপুরে তখন শুরু হয়েছে এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। দুই ভাইয়ের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হলেও যেহেতু জন্মান্ধ, তাই পাণ্ডু রাজা হলেন। পাণ্ডুর অকালমৃত্যুর পর আবার ভীষ্মের নির্দেশে বিদুরের সহায়তায় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যপাট চালাচ্ছেন। ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা চলছে এবার যৌবরাজ্যে বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রকে অভিষিক্ত করতে হবে। ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক। কিন্তু পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির রাজপুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, তাই নীতিগতভাবে বাধ্য হয়ে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করতে হলো। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হওয়ায় হস্তিনাপুরের প্রজারা আনন্দিত হলো। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুররা প্রীত হলেন। আবার একজন ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। তিনি দুর্যোধন। নগরে, হাটে-বাটে সর্বত্র যুধিষ্ঠিরের গুণগান। এতে দুর্যোধনের গাত্রদাহ আরও বেড়ে গেল। আপনজনদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন দুর্যোধন। মাতুল শকুনি, অনুজ দুঃশাসন, অঙ্গরাজ্য থেকে ছুটে এলেন মিত্র কর্ণ। প্রাথমিক মন্ত্রণার পর বিরসবদনে দুর্যোধন গেলেন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। বোঝালেন বর্তমানে প্রজারা চাইছে ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তে যুধিষ্ঠির রাজা হোক। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা হিসেবে আর কেউ চাইছে না। হয়তো পিতামহ ভীষ্মেরও এই মত। যুধিষ্ঠির রাজা হলে তার পুত্র রাজা হবে, দুর্যোধন, দুঃশাসন-সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা হবে প্রজা। ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তেজিত করার জন্য দুর্যোধন আরও বললেন—আমার জন্ম বৃথা, জীবন বৃথা, এই শরীর বৃথা, পরভাগ্যজীবী হয়ে আমি বাঁচতে চাই না। আপনার সামনেই আমি প্রাণত্যাগ করব।

পুত্রের এহেন বাক্য ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরে শেলের মতো বাজল। আবার মন্ত্রণাসভা বসল শকুনি, কর্ণ আর দুঃশাসনদের নিয়ে। দীর্ঘ মন্ত্রণার পর সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর থেকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু বিনা করণে পাণ্ডবদের দূরে পাঠাতে গেলে তারা সম্মত হবে কেন? তাছাড়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর তাঁরা রাজি হবেন না। বিনা কারণে পাণ্ডবদের দূরে কোথাও পাঠালে প্রজাবিদ্রোহ ঘটতে পারে। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। দুর্যোধন প্রচুর পারিতোষিক দিয়ে অনেক অমাত্য ও রাজপুরুষদের নিয়োগ করলেন যারা ক্রমান্বয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে নগর বারণাবতের মহিমাকীর্তন করতে লাগল। বারবার এই নগরের মহিমা শুনে যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বারণাবত যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। স্বেচ্ছায় যুধিষ্ঠিরের বারণাবত যাবার আগ্রহ দেখে ধৃতরাষ্ট্র বললেন— ধরাধামে বারণাবত শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভগবান মহেশ্বর সেখানে নিত্য অবস্থান করেন। তুমি বারণাবত যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছ দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। তুমি মাতা কুন্তী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে কিছুদিন বারণাবতে থেকে এস।

অতি দ্রুত প্রস্তুতি সমাপ্ত হলো। যুধিষ্ঠির হৃষ্টমনে মাতা ও ভ্রাতাদের নিয়ে যাত্রা করলেন নগর বারণাবতের পথে। এদিকে হস্তিনাপুরের এক কক্ষে বসেছে অত্যন্ত গোপন মন্ত্রণাসভা। দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ আর দুঃশাসন সেখানে উপস্থিত। যত কুকর্মে সিদ্ধহস্ত মন্ত্রী পুরোচন। দুর্যোধন তাকে নির্দেশ দিলেন পাণ্ডবেরা বারণাবতে পৌঁছানোর আগে, তাদের বসবাসের জন্য দাহ্যপদার্থ দিয়ে এক গৃহ নির্মাণ করতে হবে। পাণ্ডবরা ওই গৃহে বসবাস শুরু করলে গভীর রাতে অগ্নিসংযোগ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁদের পুড়িয়ে মারতে হবে। এই কাজের জন্যে পুরোচন পাবে অশাতীত পুরস্কার।

দুর্যোধনের এই চক্রান্তে যখন বিদুর গুপ্তচরের মাধ্যমে জেনে ফেললেন। বিদুরও এক বিশ্বস্ত খনক পাঠিয়ে সেই জতুগৃহের ভিতর থেকে দূরের জঙ্গল পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটিয়ে রাখলো। যাতে কোনো বিপদ ঘটলে পাণ্ডবেরা এই সুড়ঙ্গপথে পালাতে পারে। যাত্রার সময় বিদুর যুধিষ্ঠিরকে সংকেতের মাধ্যমে অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক থাকার ইঙ্গিত দিলেন। বারণাবতের সেই জতুগৃহ সম্পর্কে পাণ্ডবেরা সচেতন থাকল। একদিন গভীর রাতে পুরোচন জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করল। পাণ্ডবেরা কুন্তী-সহ সেই সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেল। দৈবযোগে সেদিন সন্ধ্যায় পঞ্চপুত্র-সহ এক নিষাদরমণী সেই গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ভস্মীভূত হলো। গভীর রাতে অগ্নি দেখে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে জল সিঞ্চন করে অগ্নি নির্বাপণ করে। ভস্মীভূত গৃহমধ্যে পঞ্চপুত্র-সহ সেই নিষাদ রমণীর বিকৃত দগ্ধদেহ দেখতে পায়। সবার ধারণা কুন্তী-সহ পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহে ভস্মীভূত হয়েছে। এই সংবাদ হাস্তিনাপুরে পৌঁছে যায়। পরিকল্পনা সার্থক ভেবে দুর্যোধন তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে উৎসবে মেতে ওঠে। পঞ্চপাণ্ডব কুন্তী-সহ তখন গভীর অরণ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে। পাণ্ডবদের আত্মীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনকে সাধারণ প্রজারা ধিক্কার আর অভিসম্পাতে ভরিয়ে দিল।

* * * *

কুন্তী-সহ পঞ্চ পাণ্ডব সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছেন। এক পাহাড়ি উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। তখন সবে ভোর হচ্ছে, রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। চারদিকে ঘন বনানী কিন্তু কোথাও কোনো পশুপাখি দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। রাক্ষসরাজ হিরম্ব ও তার ভগ্নী হিড়িম্বার অধীনে এই বন। তারা বনের পশুপাখি নিত্য সংহার করে, তাই প্রাণভয়ে পশুপাখি দূরদূরান্তে পালিয়ে গেছে। হিড়িম্বা রোজ

সকাল হলে শিকারের সন্ধানে বেরোয়। যা সংগ্রহ করতে পারে দুই ভাই-বোন মিলে আহার করে। সেদিন সকালে ছয় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হলো হিড়িম্বার। জিহ্বা লক্‌লক্‌ করে উঠল তার। সন্তর্পণে এগিয়ে এল হিড়িম্বা শিকারের দিকে। কিন্তু এই মনুষ্যদলের মধ্যে একজন পুরুষ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহধারী। প্রশস্ত বক্ষদেশ। তাকে দেখে রাক্ষসী হিড়িম্বার নারীসত্তা জাগ্রত হলো। সে এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে সেই পুরুষটির কাছে গেল। অত্যন্ত বিনীতভাবে তার কাছে প্রেম নিবেদন করল। পুরুষটি প্রথমে সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেও পরে মাতার আদেশে তাকে সঙ্গ দিতে সম্মত হলো। এদিকে বোনের বিলম্ব দেখে হিড়ম্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বোনের সন্ধানে এসে তাকে এক মনুষ্যের সান্নিধ্যে দেখে হিড়িম্বাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ভীম তাকে রক্ষা করার জন্য হিড়িম্বকে হত্যা করেন। পরে মাতা ও অগ্রজের নির্দেশে ভীম সেই রাক্ষসী হিড়িম্বাকে রাক্ষস মতে বিবাহ করেন। তাঁদের সন্তান বীর ঘটোৎকচ। সেই বনভূমিতে কিছুদিন অবস্থানের পর হিড়িম্বা তাঁদের একচক্রা নামে এক নগরে পৌঁছে দেয়। সেই নগরে তাঁরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এক কুম্ভকারের গৃহে অবস্থান করেন। সেখানে বক নামে এক নিষ্ঠুর রাক্ষসকে বধ করে ভীম নগরবাসীদের পরিত্রাণ করেন। একদিন ভিক্ষা অন্বেষণে বেরিয়ে তাঁরা সংবাদ পান পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, কন্যা পাঞ্চালীর জন্য এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছেন। রাজপথ দিয়ে নৃপতিবর্গ চলেছেন সেই স্বয়ম্বর সভায়। পঞ্চপাণ্ডব সিদ্ধান্ত নেন তাঁরাও সেই স্বয়ংবর সভা দেখতে যাবেন। পাঁচভাই পদব্রজে চললেন পাঞ্চালের উদ্দেশে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছালেন পাঞ্চালে।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যজ্ঞসেনের অভিলাষ ছিল যে পাণ্ডুতনয় অর্জুনের হস্তে আপন দুহিতা দ্রৌপদীকে সম্প্রদান করবেন। কিন্তু জতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডবের ভস্মীভূত হওয়ার সংবাদে যজ্ঞসেনের সেই অভিলাষ অপূর্ণ থেকে গেল। তবে দ্রুপদ যজ্ঞসেনের বিশ্বাস এত সহজে পাণ্ডবদের মৃত্যু হতে পারে না। তারা হয়তো কোথাও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই কথা ভেবে দ্রুপদ যজ্ঞসেন এমন এক সুদৃঢ় দুরামনীয় শরাসন প্রস্তুত করালেন এবং কৃত্রিম আকাশ যন্ত্র নির্মাণ করে তার সঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপন পূর্বক ঘোষণা করলেন, 'যে ধনুর্ধর এই শরাসনে শরসন্ধানপূর্বক যন্ত্র অতিক্রম করে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে সমর্থ হবেন, আমি তাকেই কন্যা দান করব।' দ্রুপদ যজ্ঞসেনের দৃঢ় বিশ্বাস যে কৌন্তেয় অর্জুন ছাড়া অন্য কেউ এই লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হবে না।

এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ামাত্র চারদিক থেকে নৃপতিরা কেউ রথে, কেউ-বা গজে পাঞ্চালের দিকে অগ্রসর হলেন। রাজা দ্রুপদ রাজন্যবর্গের যথাযথ বরণ ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে এলেন দুর্যোধন প্রমুখ কৌরবেরা। মদ্ররাজ শল্য, শিশুপাল, মগধরাজ জরাসন্ধ, ভগদত্ত দন্তবক্র, এলেন বৎসরাজ, কোশলাধিপতি-সহ ভারতবর্ষের সব রাজ্যের রাজা এবং রাজকুমারেরা।

সভাস্থলে দাঁড়িয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—ভগ্নী যাজ্ঞসেনী, এই সমুদয় নৃপতিবর্গ লক্ষ্যবিদ্ধ করতে সমবেত হয়েছেন। যিনি এই কার্যে সফলকাম হবেন তুমি তাঁর গলায় বরমাল্য দেবে।

এইবার সেই বীর্যবান বলদর্পী নৃপতিরা একে একে অগ্রসর হলেন। সেই ধনুকে শর সংযোজন করা দূরে থাক, অনেকে ধনুটি তুলতেই পারলেন না। কেউ-বা ধনু উত্তোলন করে, শরযোজনা করতে গিয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হলেন। কারও অঙ্গের আভরণ সকল বিক্ষিপ্ত হলো। রাজন্যবর্গের এই দুর্দশা দর্শনে এবং কৌরবগণের উৎসাহে কর্ণ এবার এগিয়ে গেলেন রঙ্গস্থলের দিকে। বীরদর্পে ধনুক উত্তোলনপূর্বক, জ্যা-সংযুক্ত করে শরসন্ধান করলেন। রাজন্যবর্গ নিশ্চিত যে কর্ণই লক্ষ্যভেদে সক্ষম হবেন, পাণ্ডবরাও ভাবলেন দ্রৌপদীর বরমাল্য কর্ণই লাভ করবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দ্রৌপদী দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না।

সভাস্থলে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। বিমর্ষ কর্ণ সঙ্গে সঙ্গে শরাসন পরিত্যাগ করলেন। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে তাঁর সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হলো উষ্ণ রক্তস্রোত। সগৌর মুখমণ্ডল হয়ে উঠল রক্তিম। প্রচণ্ড জিঘাংসা সংবরণ করলেন কর্ণ। মিত্র দুর্যোধন কর্ণের হস্তগ্রহণ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই অপমানের প্রতিশোধ একদিন নেবেন।

ক্ষত্রিয়কুল যখন বিফল মনোরথ হয়ে একে একে প্রস্থান করছেন তখন চেদিরাজ শিশুপাল শরাসনে শরসন্ধান করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্ন জানু হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। মগধরাজ মহাবীর জরাসন্ধও শরসন্ধান করতে চেষ্টা করে ধরাশায়ী হলেন এবং গাত্রোত্থান করে আপন রাজধানীতে প্রস্থান করলেন। অতঃপর মদ্ররাজ শল্য সেই ধনুকে জ্যা-আরোপ করতে জানু পেতে ভূতলে পতিত হলেন। এইভাবে সভাস্থ অবশিষ্ট নৃপতিগণও সেই মহাধনুকে শরসন্ধানে ব্যর্থ হলে দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে বললেন, তাঁদের মধ্যে যদি তেজস্বী ধনুর্ধর কেউ থাকেন তবে লক্ষ্যভেদের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। এই আহ্বান শুনে ব্রাহ্মণরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করতে শুরু করলেন। ব্রাহ্মণ সভায় উপবিষ্ট পঞ্চপাণ্ডব, যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে অর্জুন সেই রঙ্গস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের কেউ কেউ তাঁকে এই দুঃসাহসিক কাজে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন। কেউ নিন্দা করলেন। আবার অনেকে তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি দেখে উৎসাহ প্রদান করলেন।

বীরদর্পে রঙ্গস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন অর্জুন। ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে এই মহাক্ষত্রিয়কে দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন। অর্জুন শরাসনের কাছে পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হলেন, ইষ্ট

মহাদেবকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলেন। অতঃপর কার্মক প্রদক্ষিণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে অনায়াসে ধনুক উত্তোলন করে তাতে জ্যা রোপণ করে শরসংযোজন করলেন। অতঃপর রন্ধ্রপথে জলমধ্যে দৃশ্যমান অতি কষ্টসাধ্য লক্ষ্যভেদ করে ভূপাতিত করলেন। অন্তরীক্ষে জয়দুন্দুভি বেজে উঠল। ব্রাহ্মণকুমারের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হলেন ব্রাহ্মণ মণ্ডলী। সহাস্যে এগিয়ে এলেন রাজা দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রৌপদী বরমাল্যে বরণ করলেন ব্রাহ্মণ কুমাররূপী অর্জুনকে। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত রাজন্যবর্গ হতচকিত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা সমবেতভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করেন। এত শক্তিধর রাজাদের উপস্থিতিতে এই কন্যারত্নকে নিয়ে যাবে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, এ সমগ্র রাজন্যবর্গের অপমান! অতএব সমবেতভাবে আক্রমণ করে ছিনিয়ে নাও দ্রুপদকন্যাকে, জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। তাহলেও রাজাদের সম্মান রক্ষিত হবে। নৃপতিদের এই বিড়ম্বনার জন্য দায়ী যজ্ঞসেন দ্রুপদ। তাই আগে আক্রমণ করতে হবে দ্রুপদকে। রাজন্যবর্গ ধেয়ে আসছে দ্রুপদের দিকে। ভীত দ্রুপদ আশ্রয় নিলেন ব্রাহ্মণদের কাছে। অর্জুন ও বীর বৃকোদর ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন দ্রুপদের সামনে। অর্জুন ধনুর্বাণ নিয়ে প্রতিরোধ করছেন সম্মিলিত রাজাদের। ইতিমধ্যে ভীম এক বিশাল মহীরুহ উৎপাটিত করে সেই রাজাদের আক্রমণ করলেন। কালান্তক যমের মতো ভীমের আক্রমণে মুহূর্তের মধ্যে রাজন্যবর্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু কর্ণ অনড়ভাবে আক্রমণ করলেন অর্জুনকে। তাঁর সেনাদলও বিপুল উৎসাহে অর্জুনকে আক্রমণ করল। অর্জুন প্রতিআক্রমণে তাদের পর্যুদস্ত করলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জুনের বীরত্ব দেখে অভিভূত হলেন এবং অস্ত্রসংবরণ করে অর্জুনকে বললেন—

—হে বিপ্রবর, আমার প্রণাম গ্রহণ করুণ। আপনার দেহকান্তি, শৌর্যবীর্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীতি হলাম। হে দ্বিজোত্তম, আমার বোধ হচ্ছে আপনি মূর্তিমান ধনুর্বেদ অথবা রাম, সূর্য বা স্বয়ং বিষ্ণু। আত্মপ্রচ্ছাদনের জন্য বিপ্ররূপ ধারণ করেছেন, আর আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করছি। আমি যুদ্ধার্থে অস্ত্রধারণ করলে ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় অর্জুন ছাড়া অন্য কোনো যোদ্ধা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয় না।

প্রত্যুত্তরে অর্জুন বললেন—হে কর্ণ! আমি ধনুর্বেদ নই, রাম কিংবা সূর্যও নই। আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্মণ এবং পৌরন্দর অস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েছি। আজ তোমাকে পরাজিত করার জন্য এই সমরে অবতীর্ণ হয়েছি।

ব্রাহ্মণের প্রতি কর্ণের অচলাভক্তি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার জন্যও তিনি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের দুর্জয় ব্রহ্মতেজ স্বীকারপূর্বক কর্ণ অস্ত্র সংবরণ করে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হলেন। ভীম তখনও প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেক রাজাকে পর্যুদস্ত করে শেষে শল্যের মুখোমুখি হলেন। দুজনেই বীর, কিন্তু ভীম অচিরেই শল্যকে ভূপাতিত করলেন, কিন্তু তাকে বধ করলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ শেষ হলে রাজন্যবর্গ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবরাও দ্রৌপদীকে নিয়ে চললেন একচক্রা নগরে কুম্ভকার গৃহে মাতা কুন্তীর কাছে।

এদিকে সমস্ত দিবস অতিক্রান্ত। রজনী সমাগত। পঞ্চপুত্রের দেখা নেই। কুন্তী মহাচিন্তায়। একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যমপুত্র ভীমসেনকে নিয়ে মাতার চিন্তা বেশি, প্রতিটি ক্ষেত্রে কারও না কারও সঙ্গে তার বিরোধ লেগে আছে। ভীমের ডাকে কুন্তীর চিন্তাজাল ছিন্ন হলো। ভীম মাতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

মা, আজ সারাদিন তোমার উপবাসে কেটেছে। আমরাও সারাদিন কলহের মধ্যে কাটিয়েছি। সন্ধ্যায় ভিক্ষা মিলেছে। দেখে যাও।

মাতা কুন্তী পুত্রদের আগমনে আনন্দে উচ্ছ্বাসে বললেন—যা এনেছ পাঁচভাই ভাগ করে নাও।

একথা বলে দ্রুত বাইরে এলেন, পাঁচ পুত্রের শিরচুম্বন করে দেখেন পেছনে দাঁড়িয়ে শশীমুখি দ্রুপদ কন্যা। পুত্রদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন। আবেগের বশে যে কথা বলে ফেলেছেন তার জন্য বিচলিত হলেন। এদিকে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দ্রৌপদীকে যেতে দেখে দ্রৌপদীর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছদ্মবেশে তাদের অনুসরণ করেন। কৃষ্ণ, বলরামও দ্রুপদসভা থেকে পাণ্ডবদের অনুসরণ করে কুম্ভকারগৃহে এসে কুন্তীর সঙ্গে মিলিত হলেন। দৃষ্টদ্যুম্নের কাছে ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে দ্রুপদ পঞ্চপাণ্ডব কুন্তী ও দ্রৌপদীকে পাঞ্চালে নিয়ে আসেন। সর্বজ্ঞ মুনিঋষিদের উপস্থিতিতে ব্যাসদেব ঘোষণা করলেন পূর্বজন্ম অনুসারে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীই ভবিতব্য।

* * * * *

এর মধ্যেই আপন বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেছে কর্ণ। তার সেই দিগ্‌বিজয়ের তুলনা কেবল অর্জুনের বীরত্বের সঙ্গেই করা যেতে পারে। শুরুতেই কর্ণ পরাজিত করেছিল পাঞ্চালরাজ দ্রপদকে, উত্তর ভারতের ভগদত্তকে। তারপর আরও উত্তরে পার্বত্যরাজ্য নেপালও তাঁর কাছে পরাজিত হয়।

পূর্বদিকে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, বর্কখণ্ড— আরও দূরে আবশীর যোধ্য ও অহিক্ষত্র দেশ।

দক্ষিণভারতে পরাজিত হলেন ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী, কেরলের রাজা নীল। ভদ্র রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, ম্লেচ্ছ,

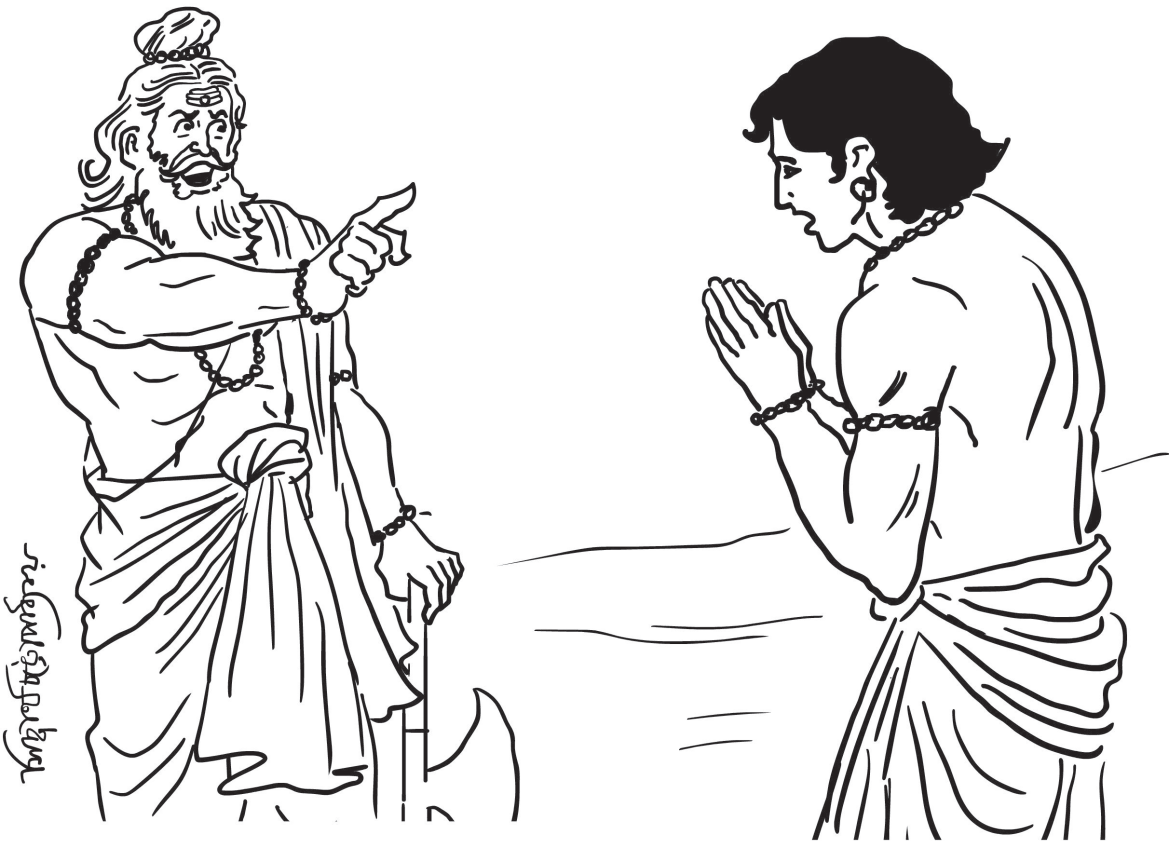

যবন ও শশব প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিগুলি। এরা কেউই কর্ণের পরাক্রমের কাছে দাঁড়াতে পারেনি।

অবন্তীদেশের রাজা ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সঙ্গে সামনীতি সন্ধিতে মিলিত হয়ে কর্ণ জয় করলেন সমগ্র পশ্চিম ভারত।

দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত করে মহাবীর কর্ণ ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। দুর্যোধন বিজয়তোরণ নির্মাণ করে কর্ণকে অভ্যর্থনা জানাল।

চিরদিন চির অবজ্ঞাত, স্নেহবঞ্চিত মহাবীর কর্ণের এই দিগ্‌বিজয় তাঁর নিজের জন্য নয়। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের বিজয় মুকুট যে হাসতে হাসতে পরিয়ে দিল মিত্র দুর্যোধনের শিরে। সুহৃদ দুর্যোধন, বন্ধু দুর্যোধন, হোক সে পাপমতি, কুচক্রী, অধার্মিক। তবুও সে তার মিত্র, অসময়ের আশ্রয়দাতা, রাজ্যলাভের একমাত্র সহায়ক।

কর্ণের সুশাসনে অঙ্গরাজ্য তখন সমগ্র ভারতবর্ষে এক সেরা রাজ্য। সর্বত্র সুখসমৃদ্ধি, প্রজারা প্রতিনিয়ত ধর্ম-কর্মে নিরত। দানশীলতায় কর্ণের সমকক্ষ কোনো রাজা সমসাময়িক ভারতবর্ষে আর ছিল না। শুধু অঙ্গরাজ্য নয় দূরদূরান্তের রাজ্য থেকেও প্রার্থীরা সবসময় সমবেত হতো অঙ্গের প্রাসাদ অঙ্গনে। রানি পদ্মাবতী আক্ষরিক অর্থেই সহধর্মিণী। পুত্র বৃষকেতু শৈশব থেকেই বীর, ধর্মশীল, অকুতোভয়। এক কথায় অঙ্গরাজ্য এক ধর্মরাজ্য।

একদিন রাজসভায় বসেছেন কর্ণ। বিচারপর্ব শেষ, শেষ দান পর্বও। এমন সময় এলেন এক প্রার্থী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত অবয়ব। তাঁকে দেখে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন কর্ণ। উত্তম আসনে বসালেন। হাত যুক্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন—দেব, আদেশ করুন আপনার কী সেবা করতে পারি?

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বললেন—আমি নরমাংস ভক্ষণে ইচ্ছুক। ব্রাহ্মণের কথা শুনে চমকে উঠলেন কর্ণ। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য রক্ষীকে আদেশ দিলেন কারাগার থেকে কোনও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কোনো বন্দিকে হত্যা করে, তার মাংস দিয়ে ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণ করতে।

ব্রাহ্মণ কর্ণের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন—

তা হবে না। আমি তোমার পুত্রের মাংস ভক্ষণ করতে চাই।

অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল কর্ণের, কিন্তু স্থির হতেও সময় লাগল না। শান্তকণ্ঠে বললেন—

তাই হবে দেব। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

সভাকক্ষে একটা গুঞ্জন উঠল। আমাত্যগণ, সেনাধ্যক্ষগণ সরোষে দণ্ডায়মান হলেন। ব্রাহ্মণ আবার বললেন—আমার

কথা এখনও শেষ হয়নি। তোমার পুত্রকে বধ করবে তুমি আর তোমার রানি পদ্মাবতী।

আর্তনাদ করে উঠলেন সেনাধ্যক্ষ বীরবাহু—

মহারাজ! ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এ এক নরপিশাচ। আদেশ করুন এই মুহূর্তে এর শিরশ্ছেদ করি। যদি ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় সেই পাপের ভাগী আমি।

কর্ণ ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন বীরবাহুকে। ইতিমধ্যে সবকিছু জ্ঞাত হয়ে বৃষকেতু উপস্থিত হয়েছে পিতার সামনে। বীরদর্পে বলল—পিতা! আপনি হৃষ্টমনে এই ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার দাতাকর্ণ নামে কলঙ্ক লাগতে দেবেন না। আমার এই নশ্বর দেহ যদি ব্রাহ্মণের সেবায় লাগে তবে আমার জীবন সার্থক। আমি মাকে ডেকে আনছি আপনারা এই পূজ্য ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূরণ করুন।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন—দাতা কর্ণ, আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। তোমরা অক্ষম হলে বলো, আমি অন্যত্র আহারের সন্ধান করি।

করজোড়ে কর্ণ বললেন—না প্রভু, আপনার অভিপ্রায় আমরা পূরণ করব।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন—আমার আরও একটা শর্ত আছে।

কর্ণ বললেন—আবার শর্ত!

পুত্রকে বধ করার সময় তোমাদের চোখ দিয়ে যেন একফোঁটা অশ্রুপাতও না হয়।

এই সংবাদ ততক্ষণে অন্তঃপুরে পৌঁছে গেছে। আলুথালু বেশে রাজসভায় ছুটে এসেছেন রানি পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন—না, প্রভু না, আপনি আমার মাংস ভক্ষণ করে তৃপ্ত হোন। আমার সন্তানকে রেহাই দিন।

দাতা কর্ণ, আমি তাহলে অন্যত্র চললাম।

না প্রভু, আমি সত্যভ্রষ্ট হবো না। শান্ত হও পদ্মাবতী। সুযোগ্যা সহধর্মিণীর কর্তব্য পালন করো। এসো, আমার হাতে হাত রেখে অস্ত্রধরো। বৎস বৃষকেতু, নারায়ণ স্মরণ করো। পরজন্মে যদি সাক্ষাৎ হয় পুত্রহন্তা, পাষণ্ড বলে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

নতজানু হয়ে হাত জোড় করে বলল বৃষকেতু—

পিতা, আমার জীবনদেবতা, দাতা কর্ণ, আমার গর্ব। জন্ম জন্মান্তরে যেন আমি আপনাদের সন্তান হয়ে জন্মাই। আর দেরি করবেন না পিতা। কর্তব্য পালন করুন।

হেঁটমুণ্ড হয়ে বসল বৃষকেতু। কর্ণ বললেন—পদ্মাবতী আমার হাতে হাত রেখে অসি ধারণ করো।

নিষ্কোষিত করলেন তলোয়ার। দুজনে একসঙ্গে অস্ত্রধারণ করে চক্ষুমুদ্রিত করে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তারপর প্রচণ্ড আঘাত। উপস্থিত সভাসদ্‌গণ সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করলেন। কিন্তু কোনো আর্তনাত শোনা গেল না, শোনা গেল সমধুর বংশীধ্বনি। সভয়ে চক্ষু উন্মিলীত করলেন সকলে। চোখের সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য। স্বয়ং বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে বংশীবাদন করছেন সামনে জোড় হাতে বসে আছে বৃষকেতু, মুখে স্মিতহাস্য। এবার অশ্রুজলে সিক্ত হলেন রাজদম্পতি। কর্ণ বললেন—

প্রভু! এ তোমার কী লীলা?

বংশীধারী বললেন—সত্যি তুমি দাতা কর্ণ। চন্দ্র সূর্য যতদিন উদিত হবে পৃথিবী ততদিন দাতা কর্ণের নাম উচ্চারণ করবে। ধন্য কর্ণ, তুমি ধন্য।

বংশীধারীকে আর দেখা গেল না।

* * * * *

দুর্যোধনের একান্ত বিশ্বাসভাজন গুপ্তচরেরা সংবাদ দিয়ে গেছে। জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়নি। সম্প্রতি পাঞ্চাল রাজ্যে লক্ষভেদ করে অর্জুন পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করেছে। মাতা কুন্তীর আদেশে এবং ব্যাসদেবের বিধানে পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি তাঁরা মাতা কুন্তী-সহ পাঞ্চাল রাজ্যে দ্রুপদ রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন।

এই সংবাদে দুর্যোধনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। জরুরি মন্ত্রণা প্রয়োজন, মিত্র বসুসেন কর্ণ এই মুহূর্তে অঙ্গরাজ্যে। পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, কৃপ, খুল্লতাত বিদুর এঁরা প্রত্যেকেই পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে বার্তাবাহক ছুটল অঙ্গদেশে। বার্তা পেয়ে দ্রুত হস্তিনায় পৌঁছে গেলেন কর্ণ। এদিকে পাণ্ডবদের কুশল সমাচার বিদুর পৌঁছে দিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। পাণ্ডবদের কুশল সংবাদে অন্ধ রাজার অন্তর দগ্ধ হলেও বিদুরের কাছে তা গোপন করে বললেন—

অতি উত্তম, তারা পাণ্ডুর পুত্র হলেও আমি তাদের আপন সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাদের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে। মহাবীর পাণ্ডবেরা মহাবলপরাক্রান্ত বান্ধবগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্ছে যে, আমার দুরাত্মা পুত্রদের আর নিস্তার নেই। শক্তিশালী দ্রুপদের পরমাত্মীয় হয়ে এবার তারা কৃতকার্য হওয়ার নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বোধোদয় হয়েছে ভেবে বিদুর হৃষ্টমনে অগ্রজের পাদস্পর্শ করে বললেন—

মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।

এইকথা বলে বিদুর সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলে, এতক্ষণ অন্তরালে থাকা দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে আগমন করল।

দুযোর্ধন বলল—

তাত! বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোনোপ্রকার গোপন

আলোচনা করতে পারবো না। তাই আমাদের অভিলাষ আপনার কাছ্যে ব্যক্ত করি। আপনার ইচ্ছা আমরা বুঝতে পারছি না। শত্রুদের সৌভাগ্যকে আপনি আপন সৌভাগ্য মনে করছেন। বিদুরের নিকট সপত্নদের স্তুতিবাদ করছেন। হে তাত! শত্রুদের উৎখাত করা এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কর্তব্য। এক্ষণে এই বিষয়ে আমি এবং মিত্র কর্ণ আপনার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করতে চাই।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

তোমাদের যা পরিকল্পনা তাতেই আমার সম্মতি থাকবে। বিদুরের কাছে অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। তাই আমি তাঁর কাছে সর্বদা পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করে থাকি।

সরলমতি বিদুর আমার অভিপ্রায় বুঝতে পারে না। এখন হে দুর্যোধন তুমি যা বিবেচনা করেছ বলো। রাধেয়, তুমিও যা মনে করেছ বল। এসময়ে বলার কোনো বাধা নেই।

দুর্যোধন বললেন—

তাত! আমার বিবেচনায় পাণ্ডবতনয়দের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে তাদের প্রথমে হীনবল করতে হবে। কুশলী পুরুষদের নিয়োগ করতে হবে যারা সুকৌশলে বহুপতির অশেষদোষ উল্লেখপূর্বক দ্রৌপদীর হৃদয় দূষিত করে কলহ উৎপাদন করুক। অথবা উপায়কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী বলবান পুরুষ গোপনে ভীমসেনকে হত্যা করুক, যেহেতু ভীম তাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা বলবান। অর্জুন তার সাহসেই সাহসী হয়ে আমাদের তৃণতুল্য জ্ঞান করে। বৃকোদর পাশে থাকলে অর্জুন অপরাজেয়। কিন্তু ভীম ছাড়া অর্জুন একাকী রণস্থলে কর্ণের চতুর্থাংশরূপে পরিগণিত হতে পারে কিনা সন্দেহ। ভীম ব্যতীত তারা নিজেদের দুর্বল এবং আমাদের অধিক বলবান ভেবে আর রাজ্যের প্রত্যাশা করবে না। অথবা তাদের হস্তিনাপুর আনার জন্য রাধেয়কে প্রেরণ করুন তাদের একত্রিত করে কৌশলে যমালয়ে প্রেরণ করুন।

হে তাত! এই উপায়সমূহের মধ্যে আপনি যা উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরাৎ তার প্রয়োগ করুন। মিত্র কর্ণ, তোমার মতামতও ব্যক্ত কর।

কর্ণ এতক্ষণ কোনও মন্তব্য করেননি। এবার বললেন—

মিত্র দুর্যোধন! তোমার পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত বোধ হচ্ছে না। আগেও তুমি অতি সূক্ষ্ম কৌশলদ্বারা পাণ্ডবদের নিগ্রহের চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তাতে কৃতকার্য হতে পারনি। যখন পাণ্ডবেরা শৈশবাবস্থায় সহায়বিহীন হয়ে এই প্রাসাদে অবস্থান করছিল তখনও অনেক চেষ্টা করেও তুমি তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারনি। বর্তমানে তারা আত্মশক্তিতে প্রবল এবং বৈদেশিক সহায় সম্পন্ন। যারা একপত্নীতে অনুরক্ত তাদের সৌভ্রাতৃত্ব অবশ্যই বদ্ধমূল। সুতরাং তাদের পরস্পর ভেদ উপস্থিত করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। অতএব হে তাত, পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হতেই তাদের যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের পক্ষ প্রবল এবং পাঞ্চাল পক্ষ হীনবল থাকতেই তাদের প্রহার করতে হবে।

মিত্র দুর্যোধন, যতক্ষণ পর্যন্ত পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল রাজের পরিপূর্ণ সামরিক সাহায্য প্রাপ্ত না হচ্ছে এবং স্বয়ং যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের রাজ্য উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে পাঞ্চালদের সঙ্গে মিলিত না হচ্ছে তার আগে তোমার বিক্রম প্রকাশ কর। আমাদের সমবেত বিক্রমের দ্বারা পাণ্ডবদের পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করে নিঃসপত্ন রাজ্যভোগ কর।

কর্ণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

হে কৃতাস্ত্র, মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন। এই বীরবাক্য তোমারই উপযুক্ত বটে। কিন্তু এক্ষণে আমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সম্মতি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরাগ। তোমরা দুইজন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করণীয় তা স্থির কর।

ধৃতরাষ্ট্রের কথায় কর্ণ ও দুর্যোধন দুজনেই অত্যন্ত হতাশ হলেন তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে তাঁরা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন। কর্ণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে ভীষ্ম একদম সহমত পোষণ করলেন না। ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডবদের সঙ্গে অযথা সংগ্রামে আমি তোমাদের সঙ্গে সহমত নই। আমার কাছে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ে সমান। গান্ধারীর পুত্ররা আমার কাছে যেমন, কুন্তীর পুত্ররাও তার চেয়ে কম নয়। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবেরা আমার, তোমার, দুর্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়। সুতরাং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সর্বতোভাবে অবিধেয়। বরং অর্ধরাজ্য প্রদানপূর্বক পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা উচিত, কারণ হস্তিনাপুর তাদেরও পৈতৃক রাজ্য। দুর্যোধন তুমি যেমন ভাব এটি তোমার পৈতৃক রাজ্য; পাণ্ডবরাও সেরকম বিবেচনা করে থাকে। পাণ্ডবরা রাজ্য প্রাপ্ত না হলে শাস্ত্রানুসারে তোমারও এই রাজ্যে অধিকার নেই। হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁদের পৈতৃক অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। রাজ্যে উভয় পক্ষেরই অধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, পাণ্ডবেরা এক মতাবলম্বী, ধর্মনিরত ও অধর্মপরাঙ্মুখ। অতএব যদি ধর্মরক্ষা করা কর্তব্য হয় এবং যদি আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে, তবে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

কর্ণ ও দুর্যোধনের চোখে মুখে বিরক্তিরেখা ফুটে উঠলেও তাঁরা প্রকাশ্যে এখন কোনো কথা বললেন না। এবারে আচার্য দ্রোণ বললেন।

—মহারাজ, শাস্ত্রে আছে মন্ত্রণার্থে হিতৈষী বিজ্ঞ পুরুষদের মতকে মান্যতা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত আমারও সেই মত। পাণ্ডবদের যথোচিত রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, তাতে ধর্ম রক্ষা হয়। আপনি সত্বর পাঞ্চাল রাজ্যে

মহারাজ দ্রুপদের কাছে কোনো রাজপুরুষকে প্রেরণ করুন। এবং এই বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে পঞ্চপাণ্ডব-সহ দ্রৌপদীকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করুন। পাণ্ডবদের প্রত্যাগমনে আপনি ও দুর্যোধন যে সবিশেষ আগ্রহী, সেই রাজপুরুষ যেন তাও ব্যক্ত করেন। মহারাজ! গঙ্গাপুত্র মহামতি ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি সন্তানতুল্য পাণ্ডবদের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করুন।

পিতামহ ও গুরুর এমন প্রস্তাব শুনে ক্ষুব্ধ দুর্যোধন নিজে কিছু না বলে মিত্র কর্ণকে কিছু বলার জন্য ইঙ্গিত করতে লাগলেন। দুর্যোধনের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কর্ণ তাঁরই প্রীত্যার্থে বলতে লাগলেন—মহারাজ! আপনি অর্থ ও মান দ্বারা সর্বদা যাঁদের সৎকার করে থাকেন, এবং সর্বকার্যে যাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করলেন না। এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কী আছে? যিনি দুষ্টমন আর প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা অন্যকে হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হতে পারেন? মহারাজ। যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সমুদয় লোক বিরোধী হলেও আপনি অনায়াসে অভীষ্টলাভ করবেন। নতুবা একান্ত যত্ন করলেও অভীষ্ট লাভ অসম্ভব। এক্ষণে আপনি মন্ত্রীগণের সাধুতা ও অসাধুতা পর্যালোচনা করে দুষ্টের ও সত্যের বাক্য বিবেচনা করুন।

কর্ণের এই অশিষ্ট বচন শুনে আচার্য দ্রোণ বললেন—

কর্ণ! তুমি কেবল নিজের মনোগত ভাবদোষে এই কথা উল্লেখ করছ। হে দুষ্ট, তুমি পাণ্ডব সম্পর্কে রাজার কাছে আমাদের প্রতি দোষারোপ করছ। কর্ণ, আমি পরম হিতকর বাক্য বলেছি, তুমি সেই বাক্যকে পুষ্টবাক্য বলছ। যদি এর থেকে কোনো সুপরামর্শ প্রদান করতে পার কর। কিন্তু আমার মতে এর অন্যথা করলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হবে, সন্দেহ নেই।

আচার্যকে ক্রুদ্ধ দেখে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

আচার্য! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। দুর্যোধন, কর্ণ এরা চঞ্চল মতি। শাস্ত্র, ধর্ম ও বাস্তব সম্পর্কে এদের জ্ঞান সীমিত। এইবার আমি যিনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, বাস্তববাদী আমার অনুজ শ্রী বিদুরের মতামত চাইছি।

বিদুর এতক্ষণ নীরবে সকলের মতামত শুনছিলেন। এবার রাজার আদেশ পেয়ে বললেন—

মহারাজ! হিতার্থীগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করবেন। কিন্তু আপনার শোনার ইচ্ছা না থাকলে সেই হিতকর বাক্যসমূহ বিফল হবে। কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আপনি তা গ্রহণ করলেন না, আচার্য দ্রোণও আপনার পুত্র ও পাণ্ডবদের জন্য অনেক মঙ্গলদায়ক কথা বললেন। কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তা আপনার হিতকর বিবেচনা করলেন না। এখন এই দুই পুরুষসিংহ ছাড়া কোন্ ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ও আপনার পরমমিত্র, তা ভেবে স্থির করতে পারছি না। এঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, পরাক্রম ও বয়ঃক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে স্নেহপরায়ণ। অতএব মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণ মহারাজের অশুভ সংকল্পে মন্ত্রণা করবেন তা অকল্পনীয়।

মহারাজ! পৌর ও জনপদবাসীরা পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনে, তাঁদের দেখার জন্য অতিমাত্র উৎসুক হয়েছে, এইবার তাদের প্রিয়কার্য সম্পাদন করুন। দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এরা নিতান্ত অধার্মিক, দুর্বুদ্ধি ও বালকস্বভাব। এদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি দুর্যোধনের অপরাধে এই মহান বংশ উচ্ছন্নে যাবে।

ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের বাখ্যা সম্যক অনুধাবন করে পাণ্ডবদের দ্রৌপদী-সহ সসম্মানে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচুর উপঢৌকন-সহ বিদুরকে রাজপ্রতিনিধি রূপে পাঞ্চাল রাজ্যে প্রেরণ করলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সেই স্থান ত্যাগ করলেন। বিদুরের সৌজন্যে অবিভূত পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ ও রাজপরিবারবর্গ আদরিণী রাজদুহিতাকে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে প্রভুত উপহার সামগ্রী ও দাসদাসী-সহ রাজকীয়ভাবে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করলেন।

হস্তিনাপুরে দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনির দল ছাড়া সমস্ত পুরবাসী আনন্দে মেতে উঠল। বধূমাতা-সহ কুন্তীপুত্রদের আগমন প্রতীক্ষায় নগরবাসীরা রাজপথের দু'ধারে সমবেত হবেন। সঙ্গে বরণডালা, মঙ্গলঘট, মঙ্গলশঙ্খ। অবশেষে নগরে প্রবেশ করলেন পাণ্ডবরা, বহুকাল পরে তাঁদের দর্শন করে পুরবাসীরা আনন্দে মাতোয়ারা। তাঁদের বরণ করতে গিয়ে সবাই উন্মাদপ্রায়। গান্ধারী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীরা নববধূ দ্রৌপদীকে ধর্মীয় আচার পালন করে সাদরে বরণ করলেন। অতঃপর পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ গুরুজনদের পাদবন্দনা করে বিশ্রামার্থে নির্দিষ্ট আপন আপন কক্ষে প্রবেশ করলেন।

আহারাদি ও বিশ্রামপর্ব শেষ হলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম পাণ্ডবদের আহ্বান করে এক মন্ত্রণা কক্ষে সমবেত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন—

বৎস কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আমার বাক্য শ্রবণ ও তার মর্ম বিবেচনা কর। তোমরা রাজ্যের অর্ধাংশ গ্রহণ করে খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে বাস কর। তাহলে দুর্যোধনের সঙ্গে তোমাদের পুনরায় বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, তেমনি অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদের সেইরূপ রক্ষা করলে আর কেউ তোমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। পিতামহ ভীষ্ম ও এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করলেন। সিদ্ধান্ত হলো পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে নতুন রাজধানী পত্তন করে বসবাস করবেন।

পাণ্ডবেরা অর্ধরাজ্য প্রাপ্তির প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। অতঃপর গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে এবং তাঁদের চরণে প্রণিপাত করে সুহৃদ সখা কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করলেন। অতি সুরক্ষিত ও রমণীয় এই নগর। নানাবিধ বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত এক সুরম্য প্রাসাদে পাণ্ডবেরা প্রবেশ করলেন। সশস্ত্ররক্ষী ও দাসদাসীরা তাঁদের সেবা যত্নের ত্রুটি রাখল না। পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে আগমনাবার্তা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক এবং বিভিন্ন পেশায় সুনিপুণ শূদ্রগণ এসে আলাদা আলাদা স্থানে বসতি স্থাপন করল। অচিরেই ইন্দ্রপ্রস্থ এক সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হলো। এরমধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। অর্জুন যাদবকন্যা বলারামের ভগ্নী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেছেন। অগ্নির রোগ মুক্তির জন্য কৃষ্ণ অর্জুন খাণ্ডববন দহন করেছেন সমস্ত প্রাণীকুল-সহ। একমাত্র বিশ্বকর্মার পুত্র দানবশিল্পী ময়দানবকে মুক্তি দেন। প্রত্যুপকারে ময়দানব খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদের জন্য এক মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন যার তুলনা ভূ-ভারতে নেই। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবেরা বীরত্বের সঙ্গে দিগ্বিজয় সমাপ্ত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ও সহায়তায় ভীম মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করে তাঁর কারাগারে বন্দি রাজাদের মুক্ত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করার অনুমতি দিলেন। কৃষ্ণের অনুমতি পেয়ে যুধিষ্ঠির সহদেবকে নৃপতি, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতিকে নিমন্ত্রণ করার আদেশ দিলেন। সহদেব দিকে দিকে দূত পাঠিয়ে সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রিতরা হৃষ্টমনে যজ্ঞদর্শনার্থে আগমন করলেন। যজ্ঞের সমারোহ শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত রাজন্যবর্গ সপার্ষদ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গ, অঙ্গরাজ কর্ণ, গান্ধাররাজ মহাবল শকুনি, অচলবৃষক, শল্য, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, শাল, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূল নিবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, আকর্ষ, কুন্তল, মালবদেশীয় ভূপালগণ, অন্ধকগণ, দ্রাবিররাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীর দেশীয় রাজা, কুন্তীভোজ, গৌরবাহন, বিরাট ভূপতি, শিশুপাল প্রমুখ মহার্ঘ উপহার সামগ্রী-সহ ধর্মরাজের যজ্ঞ দর্শনে আগমন করলেন।

এদিকে বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বীর্যবান, চারুদেষ্ণ, কীঙ্ক, উল্মুখ, নিশঠ, মহাবীর অঙ্গবাহ প্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হলেন।

যুধিষ্ঠির সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁদের পৃথক পৃথক বাসস্থান প্রদান করতে নির্দেশ দিলেন। সকল গৃহই নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রমণীয় দীর্ঘিকা ও পাদপসমূহে সুশোভিত ছিল। দুর্যোধনের ইচ্ছানুযায়ী কর্ণ ও দুর্যোধনের জন্য পাশাপাশি গৃহ নির্ধারিত হলো। পাণ্ডবদের এমন বৈভব দর্শনে দুর্যোধন অত্যন্ত বিমর্ষ হলে কর্ণ বললেন—

—মিত্র! পাণ্ডবদের এই বৈভব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আমরা অচিরেই মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে এমন এক কৌশল নির্ধারণ করবো যাতে পাণ্ডবদের পথে বসতে বিলম্ব না হয়।

কর্ণের এই প্রবোধ বাক্যে দুর্যোধন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন—

—মিত্র কর্ণ, আমাদের সকল পরিকল্পনা বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আর ক্রমশ পাণ্ডবদের বিত্ত, বৈভব আর পরাক্রম গগনচুম্বী হচ্ছে।

—মিত্র, আমরা এবার এমন এক জাল বিস্তার করবো যা থেকে পাণ্ডবরা আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। তবে এই কর্মে মাতুল শকুনিকে নিতে হবে মুখ্য ভূমিকা। ন্যায়বিধি মেনে হবে আমাদের এই ষড়যন্ত্র। পাণ্ডবহিতৈষী গুরুজনেরাও তাতে বাধা দিতে পারবেন না।

—মিত্র কর্ণ! নিশ্চিদ্র অন্ধকারে তুমি আমাকে যেন একটা আলোর দিশা দেখালে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রটা কী?

—ক্রমশ প্রকাশ্য। আগে মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ হোক।

এই সময়ে সহদেব যুধিষ্ঠিরের বার্তা নিয়ে এলেন। ধর্মরাজ দুর্যোধনকে যজ্ঞ ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিতে চান। তিনি এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে যুধিষ্ঠির প্রীত হবেন। কর্ণের ইঙ্গিতে দুর্যোধন এই দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুঃশাসন অশ্বত্থামা, সঞ্জয় প্রমুখ এক একটি গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলেন। ঋষিগণ কর্তৃক সুচারুরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধের মধ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ পরিসমাপ্তি হলো। রাজন্যবর্গ ও বিশিষ্ট অতিথিরা স্ব-স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। হস্তিনায় প্রত্যাবর্তনের পর দুর্যোধনের মনোপীড়া আরও বেড়ে গেল। আহারে রুচি নেই, নিদ্রায় আগ্রহ নেই, চক্ষু মুদ্রিত করলেই ভেসে উঠছে পাণ্ডবদের অফুরন্ত বিত্ত বৈভব, ধনরত্ন, প্রজাদের নিশর্ত আনুগত্য। যার কৌরবদের তুলনাই হয় না। শুধু কৌরব কেন, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী তা দেবরাজেরও নেই, যমরাজেরও নেই, বরুণদেবেরও নেই। দুর্যোধনের এই মানসিক অশান্তিতে সমব্যথী মিত্র কর্ণ ও মাতুল শকুনি। এই সময়ে একদিন শকুনি প্রকাশ্যে দুর্যোধনকে বললেন—

—প্রিয় দুর্যোধন! তোমার মর্মপীড়ার কারণ আমি অবগত। পাণ্ডবের অশেষ ঐশ্বর্য, অতুল প্রতিপত্তি, অপরিমেয় ক্ষমতা

011-32306597
011-30306592

SNEH RAMAN
ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

With Best Compliments from-

Laghu Udyog Bharati

All India Organisation in the Service of small scale industries

ADVOCATE ARVIND DHUMAL

All India Vice President
Co-ordinator Punjab, Chandigarh, J/K & Laddakh

With Best Compliments from -

ARIES ENGINEERS

JALANDHAR
PUNJAB
M: 9815479543

With Best Compliments from -

SANT VALVES PVT. LTD.

G.T. Road, By-pass,
Jalandhar
Pin - 144012 (PB.) India

Mfrs. of **SANT**
IBR CERTIFIED : BRONZE, CAST IRON, CAST STEEL, FORGED STEEL, BOILER MOUNTINGS
IST MARKED : GM VALVES, CI BALL VALVES, SLUICE VALVES, BUTTERFLY VALVES, **'SBM'** BRONZE INDUSTRIAL VALVES
Ph. +91 181-5084693-94-95, 2603308
FAX : +91-181-5062270
E-mail : info@santvalves.com
Website : www.santvalves.com

তোমাকে ঈর্ষান্বিত ও বিচলিত করেছে। বিনা রক্তপাতে পাণ্ডবদের সমুদয় ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা তোমার করায়ত্ত হতে পারে এমন একটি বিষয় আমার জানা আছে।

দুর্যোধন জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত। বললেন—

—মিত্র কর্ণ বলেছিলেন আপনার দ্বারা আমার অভীষ্ট পূরণ হবে। এইবার সেই গুপ্ত বিষয়টি প্রকাশ করুণ।

— পাণ্ডবদের যে রাজলক্ষ্মী প্রত্যক্ষ করেছ, তা লাভ করার উপায় শ্রবণ কর। অক্ষক্রীড়ায় আমার তুল্য অভিজ্ঞ ভূ-ভারতে দ্বিতীয়জন নেই। যুধিষ্ঠিরও অক্ষ-ক্রীড়ায় আসক্ত কিন্তু এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা নেই। ক্ষত্রিয় রীতি অনুসারে দ্যুত ও রণের আহ্বান প্রত্যাখান করা যায় না। তুমি যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতে আহ্বান কর তাকে আসতেই হবে। আমি তোমার প্রতিনিধি হয়ে কপট ক্রীড়ায় তাকে পরাজিত করে তার দিব্য সম্পদ তোমার করায়ত্ত করে দেব তাতে সন্দেহ নেই।

এই প্রস্তাবটি দুর্যোধনের অত্যন্ত মনঃপুত হলো। কালবিলম্ব না করে দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ার আবেদন জানালেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন মন্ত্রী বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি মতামত জানাবেন। দুর্যোধন বিলক্ষণ জানতেন যে বিদুর কস্মিনকালেও এই দ্যুতক্রীড়া অনুমোদন করবেন না। দুর্যোধন তখন পিতাকে বললেন—

—পিতা! খুল্লতাত বিদুর কদাপি এই দ্যুতক্রীড়ায় সম্মতি দেবেন না। কারণ তিনি পাণ্ডবদের অধিক স্নেহ করেন। তাদের অকল্যাণ হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি নিশ্চিতভাবে এই অক্ষ প্রতিযোগিতা রদ করার চেষ্টা করবেন। তিনি সর্বদাই আমার প্রিয় কার্যে বিরোধিতা করে থাকেন। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি—এইবার আপনার সমক্ষে আত্মবিসর্জন ছাড়া আমার উপায় নেই।

দুর্যোধনের বাক্যে জন্মান্ধ স্নেহান্ধ পিতা বিচলিত হলেন। তিনি বিদুরের আগমনের অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ অনুচরদের এক সুরম্য দ্যূতক্রীড়া গৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন। বিদুর এই সংবাদ অবগত হয়ে এই সর্বনাশা অক্ষক্রীড়া বন্ধের আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্ররোচনায় অনড়। এমনকী ভীষ্মের পরামর্শেও তিনি কর্ণপাত করলেন না। যুক্তি দেখালেন— যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বিদুর ও তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন, সেখানে কোনো অন্যায় বা এমন কিছু ঘটবে না যাতে কোনো পক্ষের ক্ষতি হয়। বিদুরকেই দায়িত্ব দেওয়া হলো পাণ্ডবদের অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ এবং তাঁদের সপরিবারে হস্তিনায় আনয়নের। বিদুরের গূঢ় সংকেত উপেক্ষা করে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং বিদুরের সঙ্গে সপরিবারে হস্তিনাপুরীতে আগমন করলেন।

গান্ধারী ভানুমতি প্রভৃতি পুরনারীরা দ্রৌপদীকে অভ্যর্থনা করে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষে বিশ্রামের ব্যবস্থা হলো পঞ্চপাণ্ডবদের। গোপন মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রণায় বসেছেন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন। তৈরি হচ্ছে কপট পাশাখেলার নীলনক্শা। এক চরম বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় বিপর্যস্ত বিদুর বিষণ্ণ মনে ফিরে গেলেন আপন কুটিরে।

নির্ধারিত দিনে নবনির্মিত দ্যূতগৃহে ক্রীড়ার্থে প্রবেশ করলেন কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষ। মহার্ঘ্য আসনে উপবিষ্ট পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরআষ্ট, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বিদুর। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আস্তরণযুক্ত আসনে উপবেশন করলেন। শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—

—মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই সভামধ্যে বহুবিধি লোকের সমাগম হয়েছে, সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এক্ষণে অক্ষক্ষেপ করে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক।

যুধিষ্ঠির বললেন—

—দেখ, কপট পাশাক্রীড়া অতি পাপজনক, এতে বিন্দুমাত্র ক্ষাত্র পরাক্রম নেই, বিবেচনা করলে একে রাজনীতি বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। তুমি কী কারণে দ্যূতের প্রশংসা করছ? ধূর্তের কপটাচারকে কেউ প্রশংসা করে না। অতএব হে শকুনি, দেখো তুমি যেন নৃশংসের মতো অসৎপথে আমাকে পরাজিত করো না।

শকুনি বললেন—মহারাজ! যিনি গণনায় নিপুণ, ধূর্ততায় রীতিপদ্ধতি সমুদয় সবিশেষ জানেন, অক্ষক্ষেপ বিষয়ে সুচতর ও দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি কোনো প্রকারেই পরাজিত হন না। পণই পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনো দোষ আশঙ্কা নেই। অতএব আশা আমরা ক্রীড়া আরম্ভ করি।

যুধিষ্ঠির বললেন—দ্যূতে আহূত হলে নিবৃত্ত হবো না, দ্যূতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত। অতএব বলুন এই লোকসমবায় মধ্যে আমার প্রতিযোগী কে?

তখন কর্ণের ইঙ্গিতে দুর্যোধন কপট বিনয়ের সঙ্গে বললেন—

—হে বিশাম্পতে! আমি সমুদয় ধন ও রত্ন প্রদান করব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হয়ে ক্রীড়া করবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে সর্ববিদ্যা বিশারদ! একজনের প্রতিনিধি হয়ে অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত। যাহোক সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছ ক্রীড়া আরম্ভ করা যাক্।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন—

—হে রাজন! আমি মহামূল্য সাগরাবর্ত সম্ভূত কাঞ্চন খচিত এই মরিময় হার পণ করলাম, তুমি যা দিয়ে খেলবে সেই প্রতিপণের বস্তু কোথায়?

দুর্যোধন বললেন—আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তারজন্য অহংকার করি না। যে যা হোক এইবার

দ্যুতে জয়লাভ কর।

তখন অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি অক্ষ গ্রহণ করে—'আমিতো এই জিতলাম' বলে অক্ষবিক্ষেপ করামাত্র তাঁরই জয় হলো।

প্রথমবার হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের জেদ বেড়ে গেল। এইবার তিনি একলক্ষ আট হাজার সুবর্ণ মুদ্রায় ভর্তি কলস, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত সুবর্ণ পণ রাখলেন।

এবারেও শকুনির জয় হলো। যুধিষ্ঠির থামলেন না, এইবার তিনি আট ঘোড়ায় টানা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য সহস্র রথ পণ রাখলেন। শকুনি এবারও ছলনাপূর্বক অক্ষবিক্ষেপ করে জয়ী হলো।

যুধিষ্ঠির এবার চোষট্টি কলায় পটিয়সী শত সহস্র সুন্দরী তরুণী দাসীকে পণ রাখলেন। শকুনি এবারও অবলীলায় পাশা জিতলেন। তথাপি অনড় যুধিষ্ঠির একে একে তাঁর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজি রেখে বার বার শকুনির কপট চালে হারতে লাগলেন। তখন মহাত্মা বিদুর এই কালাগ্নিরূপ দ্যূতক্রীড়ার বিষময় ফল ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। পুত্রের বারম্বার জয়ে মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথায় কর্ণপাত করলেন না। যুধিষ্ঠির তখন সর্বস্বান্ত। বাজি রাখার মতো আর কিছুই নেই। এবার যুধিষ্ঠির নিজের এবং ভ্রাতাদের সমস্ত রত্নাভরণ সমূহ বাজি রেখে হারলেন শকুনির কাছে। শকুনির প্ররোচনায় যুধিষ্ঠির আবার পাশা খেললেন বাজি রাখলেন প্রাণাধিক কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুলকে আবার হারলেন, এইবার ক্রমে ক্রমে সহদেব, অর্জুন, ভীম এবং সবশেষে নিজেকে পণ রেখে শকুনির কাছে হেরে গেলেন। এবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব যুধিষ্ঠির কিন্তু দুরত্মা শকুনি নিবৃত্ত হলো না, পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে বলল।

—হে রাজন্! তোমার পত্নী দ্রৌপদী এখনও অপরাজিতা, তুমি তাঁকে পণ রেখে আপনাকে মুক্ত কর। এক অদৃশ্য মোহপাশ যেন যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যুধিষ্ঠির সেই দ্যূতসভায় উপস্থিত গুরুজন এবং রাজপুরুষদের সমক্ষে ঘোষণা করলেন—

আমি এবার সর্বগুণান্বিতা, সর্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখলাম।

যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করা মাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদের কলেবর হতে ঘর্মবারি নির্গত হতে লাগল। বিদুর মাথায় হাত রেখে নিরুপায় ক্ষোভে সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন। আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হয়ে মনের ভাব গোপন করতে না পেরে বারবার জানতে চাইছেন দুর্যোধন জয়ী হলো কিনা? কর্ণ দুঃশাসনাদির হর্ষের আর পরিসীমা রইলো না। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে 'এই জিতলাম' বলে চীৎকার করে ছলপূর্বক অক্ষবিক্ষেপ করা মাত্রই তার জয় হলো। পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহশীল সভাসদ্গণ ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হলেন। দুর্যোধন বিদুরকে অপমান করার জন্য দ্যূতসভায় পাঞ্চালীকে নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলেন। ক্রুদ্ধ বিদুর দুর্যোধনকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। এবার দুর্যোধন প্রতিহারীর উপর দায়িত্ব দিলেন দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় আনয়নের জন্য, প্রতিহারীও এইকার্যে বিফল হলেন।

তখন দুর্যোধন সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুগামী, অনুজ দুঃশাসনকে পাঠালেন দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় জনসমক্ষে আনার জন্য। অগ্রজের আদেশ পেয়ে দুরাত্মা দুঃশাসন অন্তঃপুর থেকে রজঃস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে দ্যূতসভায় নিয়ে এল। লজ্জায় অধোবদন হলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুররা।

তখন দুঃশাসনের প্রচণ্ড আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও অবিন্যস্তবসনা ধ্রুপদনন্দিনী লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূতা হয়ে বলতে লাগলেন—

—হে দুরাত্মন! আমি রজঃস্বলা, তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণ সমক্ষে আমাকে কর্ষণ করছিস, এঁরা কেউই তোর নিন্দা করছেন না, বোধ হয় এঁদের এতে অনুমোদন আছে, হায়! ভরতবংশীয় গণের ধর্মে ধিক্। বুঝলাম—মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ এঁদের বিন্দুমাত্র সত্ত্ব নেই, প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুর্যোধনের এই বর্বরতা অনায়াসে উপেক্ষা করছেন।

দ্রৌপদীর এই কাতরোক্তির প্রত্যুত্তরে এখন পর্যন্ত কেউ দেননি। ভীষ্ম প্রথম কথা বললেন—

সূক্ষ্ম ধর্ম বিচারে এর বিধান আমি জানি না। একদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখতে পারে না, অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন, এই উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বিবেচনায় অসমর্থ হচ্ছি। দেখ, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমুদয় পৃথিবী পরিত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ধর্ম থেকে এক পদও বিচলিত হতে পারেন না। বিশেষত তিনি আপনার মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি পরাজিত হয়েছেন, তাই আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ বিবেচনা করতে পারছি না। শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, যুধিষ্ঠির স্বয়ং তার সঙ্গে ক্রীড়া করেছেন, আবার তিনি স্বয়ং তোমার এই অপমান উপেক্ষা করছেন, তাই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছি না।

ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পাণ্ডবেরা অতিশয় নিরাশ হলেন। এবং দুর্যোধনের অনুচর কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনির দল অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে দ্রৌপদীর উপর লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িয়ে দিল। এই অবস্থায় মধ্যমপাণ্ডব বৃকোদর সম্যক ঘটনার জন্য অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। প্রকাশ্যে বললেন—

—হে রাজন! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা গৃহস্থিত বারাঙ্গনাদেরও পণ রেখে ক্রীড়া করেন, তাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রদর্শন করে থাকে। আর ভিন্ন ভিন্ন দেশের নৃপতিবর্গ আপনাকে এবং

আমাদের যেসব মহার্ঘ দ্রব্যাদি উপহার দিয়েছিলেন সেই সমুদায়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও অয়ুধ সকল এবং তোমাকে এবং আমাদেরকেও শত্রুগণ জিতে নিয়েছেন, কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর, তাই আমি তাতেও ক্রোধ করিনি। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রেখে পাশাখেলা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। দেখ দুরাত্মা, নীচাশয় কৌরবগণ এবং তাদের বশংবদেরা একমাত্র তোমার দোষেই পাণ্ডবপ্রণয়িনী, কুলকামিনী দ্রৌপদীকে কীভাবে ক্লেশ দিচ্ছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছি। আজ তোমার বাহুদ্বয় আমি ভস্মসাৎ করবো, সহদেব শীঘ্র আগুন নিয়ে এস।

ভীসেনের এই ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখে সভাস্থ সকলে ভীত হলেন। কর্ণ, দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন প্রমুখ ভীমের হাতে যুধিষ্ঠিরের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখার জন্য উৎসাহিত করলেন। তখন অর্জুন ভীমসেনকে লক্ষ্য করে বললেন—হে বৃকোদর! তুমি পূর্বে কখনও এমন দুর্বাক্য প্রয়োগ করোনি। স্পষ্টই বোধ হচ্ছে, শত্রুগণ তোমার ধর্মগৌরব বিনষ্ট করেছে। আমার অনুরোধ ধর্মাত্মা অগ্রজকে অপমান করো না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণ কর্তৃক দ্যূতে আহূত হয়ে ক্ষাত্রধর্মানুসারে তাদের ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করেছেন, এতো আমাদের গর্বের।

ভীমসেন বললেন—

—হে ধনঞ্জয়! ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষাত্রধর্ম পালন করেছেন বলে এখনো পর্যন্ত তাঁর বাহুদ্বয় ভস্ম করিনি।

এইবার দ্যূত সভামধ্যে কৌরব বিকর্ণ উঠে দাঁড়ালেন। কুরুভ্রাতাদের মধ্যে সদাচারী স্পষ্টভাষী বিকর্ণ। পাণ্ডবদের দুঃখিত এবং দ্রুপদনন্দিনীকে কাতর দেখে সভাস্থ নৃপতি ও বিজ্ঞজনদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—

—মহোদয়গণ! যাজ্ঞসেনী যা বলেছেন, আপনারা সকলে তাঁর বিষয় বিশেষ বিবেচনা করে বলুন, যথার্থ বিচার না করা হলে আমাদের নরকগামী হতে হবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর এঁরা এসে এবিষয়ে কিছু বলুন। সকলের আচার্য দ্রোণ ও কৃপ এঁরা কোনো কথা বলছেন না কেন? আর যে সকল নরপতি এই সভায় বসে আছেন তাঁরাও কাম ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক যথার্থ বক্তব্য বলুন, কুলকামিনী দ্রৌপদী বারম্বার যা বলছেন তার কোন্ পক্ষ কার অভিপ্রেত বিবেচনা করুন। সদাশয় বিকর্ণ যখন দেখলেন যে, তিনি সভাসদবর্গকে যার নিমিত্ত বারবার অনুরোধ করলেন, তাতে কোনো ব্যক্তিই সাধু কী অসাধু কিছুই বললেন না। তখন এই প্রজ্ঞাবান রাজপুত্র হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করতে লাগলেন, তাঁর নিশ্বাস দ্রুততর হলো। তিনি তখন শ্লেষাত্মক ভাষায় বলতে লাগলেন—

—এক্ষণে মহাপালেরা বলুন আর নাই বলুন, আমি যা ন্যায্য বলে জানি তা অবশ্যই বলব। মহাপুরুষেরা বলে থাকেন যে, রাজাদের ব্যসন চার প্রকারের—প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর, চতুর্থ অভব্য বিষয়ে অত্যানুরাগ। মানুষ এইসকল বিষয়ে অনুরক্ত হলে ধর্ম থেকে দূরীভূত হন, লোকে তেমন ব্যসনাসক্ত পুরুষের কাজ অপ্রামাণিক বলে জানেন। দ্যূতক্রীড়ায় আহূত যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হয়ে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন, বিশেষত এই অনিন্দিত রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখার পূর্বে স্বয়ং পরাজিত হয়ে এতে স্বত্ববর্জিত হয়েছেন। এদিকে শকুনি পণার্থী হয়েও কৃষ্ণার নাম উল্লেখ করেছেন। এই সকল বিচার করে দেখলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলে স্বীকার করা যায় না।

ক্রীড়াগৃহে উপস্থিত প্রায় সকলেই এই বাক্য শ্রবণমাত্র বিকর্ণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও শকুনির নিন্দা করতে লাগল। সেই উচ্ছ্বাস কিছুটা প্রশমিত হলে কর্ণ ক্রোধপরতন্ত্র হয়ে বিকর্ণের বাহু ধারণ পূর্বক বলতে লাগলেন—

—হে বিকর্ণ! এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু আরণি থেকে অগ্নির উৎপত্তির ন্যায় এসব যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তারই বিনাশের জন্য। উপস্থিত রাজণ্যবর্গ দ্রৌপদীর প্রবতনা-পরতন্ত্র হয়েও যে কিছু বলছেন না, তার কারণ এই যে তাঁরা পাঞ্চালীকে ধর্মত জয়লব্ধ বলেই জানেন। তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসিহিষ্ণুতায় অধৈর্য হয়ে সভামধ্যে বাতুলের মতো কথা বলছ। তুমি দুর্যোধনের কনিষ্ঠ, সব বিষয়ে যথাযথ অভিজ্ঞতাও তোমার নেই, এই কারণে জয়লব্ধ দ্রৌপদীকে অর্জিত বলে প্রতিপন্ন করছ। যখন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্বস্ব পণ করলেন, আর দ্রৌপদী সেই সর্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি দ্রৌপদী জয়লব্ধ নয় তা জানলে কী করে? পাণ্ডবদের অনুমতিক্রমেই দ্রৌপদীর নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, অতএব কী কারণে তোমার কাছে দ্রৌপদী অজয়লব্ধা? আর একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে এই সভায় আনয়ন করা তুমি অধর্ম বলে প্রতিপন্ন করছ। এক্ষণে তার কারণও শ্রবণ কর। স্ত্রী জাতির এক স্বামীই দৈব এবং সামাজিক বিধান। দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করে বহুস্বামীর বশবর্তিনী হয়েছেন, অতএব ইনি যে বারাঙ্গনা তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন এবং বিবসনা করা অনৈতিক নয়। দ্রৌপদী-সহ পাণ্ডবদের যা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদয় ধর্মত জয় করেছেন। অতএব হে দুঃশাসন, তুমি বিকর্ণের বালসুলভ কথা ছাড়, তুমি পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সবকিছু কেড়ে নাও।

কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবেরা নিজেদের উত্তরীয় বস্ত্রলঙ্কার খুলে রেখে সভামধ্যে নিঃশব্দে বসে পড়লেন। দ্রৌপদী একবস্ত্রা, দুঃশাসন সেই বস্ত্র আকর্ষণ করে খুলে নেবার চেষ্টা করছে, দ্রৌপদী সর্বশক্তি দিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছেন আর বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ করছেন। কিন্তু দুঃশাসনের দানবীয় শক্তির সঙ্গে আর পেরে উঠছেন না। তথাপি শেষ চেষ্টা লজ্জা নিবারণের, আর পারলেন না, এবার

আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। ভগবান এই আত্মসমর্পণের অপেক্ষায় ছিলেন। দুঃশাসন যত দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করে জগৎপতি ধর্মরূপে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য থেকে একের পর এক বস্ত্রের স্তূপ পর্বতপ্রমাণ হলো, অবসন্ন দুঃশাসন ভুমিতে আশ্রয় নিল। এই দৃশ্য দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হলো। সভাসদ্‌গণ দ্রুপদনন্দিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে দুঃশাসনকে তিরস্কার করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর সাধুবাদে চতুর্দিক আলোড়িত হলো। ভীম পাণ্ডবদের মধ্যে বসেছিল। হঠাৎ মহানাদে গর্জন করে উঠে দাঁড়াল ক্রোধে তাঁর অধরোষ্ঠ কম্পিত, কম্পিত হস্তপদ, ঘুর্ণায়মান নয়নযুগল। তাঁর মহানাদে সভাস্থল স্তব্ধ, তিনি সভায় উপস্থিত সভ্যদের সম্বোধন করে প্রতিজ্ঞা করলেন—

—হে লোকবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার কথা শ্রবণ কর। এমন বাক্য পূর্বে কেউ কখনও বলেনি এবং বলবেও না। এই পাপাত্মাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য, আর সেই যুদ্ধে যদি বলপূর্বক এই নরাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রুধির পান না করি, তাহলে আমি যেন পূর্বপুরুষগণের গতিপ্রাপ্ত না হই।

উপস্থিত রাজন্যবর্গ ভীমসেনের এই প্রকার ভীমবাক্য শ্রবণে দুঃশাসনের কুৎসা এবং ভীমের প্রশংসা করতে লাগলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়গণকে অবলোকন করেও কোনো প্রশ্ন করতে পারছেন না। সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করে পরিতাপ করতে লাগলেন। তখন সর্বধর্মজ্ঞ বিদুর সভাসদগণকে নিবারণ করে বলতে লাগলেন।

—হে সভ্যগণ! দ্রুপদনন্দিনী অনাথার ন্যায় বার বার রোদন করছেন, আপনাদের কাছে ন্যায় প্রার্থনা করছেন। আপনারা কোনো বিহিত করছেন না, এতে ধর্মকে পীড়া দেওয়া হচ্ছে। আর্তজন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভায় আগমন করে, সভ্যগণের উচিত যে, সত্য ও ধর্ম দ্বারা তাঁকে প্রশমিত করা আপনারা কেউ এই কর্তব্য পালন করছেন না। কামক্রোধাবেগ বিবর্জিত হয়ে দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞা অনুসারে সিদ্ধান্ত করেছেন। এক্ষণে আপনাদের ওই প্রশ্নের যথাবিহিত মীমাংসা করা উচিত।

বিদুরের বাক্য শ্রবণের পর উপস্থিত সভ্যরা কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। তখন কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করে বললেন—

—হে দুঃশাসন। এক্ষণে দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে নিয়ে যাও।

কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দুঃশাসন কম্পমানা, সলজ্জা, অনাথা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তখন দ্রৌপদী বললেন—

—দুষ্ট দুর্যোধন! তুই ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর। সভামধ্যে আমি যে প্রশ্ন করেছি তার সদুত্তর এখনো পাইনি। এই দুষ্ট আসুরিক শক্তিতে আমাকে আকর্ষণ করায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি, তাই কৌরবসভায় কুরুগণকে নানাপ্রকার অপ্রিয় কথা বলছি। পূর্বে এই রকম বাক্য আমি মুখেও আনিনি, এক্ষণে আমি নিরুপায়। যাকে পূর্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্য পর্যন্ত দেখতে পাননি, এক্ষণে তাকে সভামধ্যে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হতে হলো। যে পাণ্ডবেরা পূর্বে গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু স্পর্শ করলে সহ্য করতে পারত না, আজ সেই পাণ্ডবরাই দুরাত্মা দুঃশাসন যে আমাকে স্পর্শ করছে তা অনায়াসেই সহ্য করে আছেন। আমি কুলকামিনী, সতী, আমার এর থেকে বেশি কষ্ট কী আছে? শাস্ত্রমতে ধর্মপরায়ণা স্ত্রীদের সভামধ্যে আনয়ন করতে নেই, কিন্তু এই অভাগিনী সভায় প্রবেশ করেছে, এক্ষণে ক্ষিতিপালকদের সেই সনাতন ঐতিহ্য কোথায় অন্তর্ধান করল? যখন পাণ্ডবদের সহধর্মিণী, পার্ষতের ভগিনী, কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সভায় এনেছ, তখন কৌরবদের পূর্বপুরুষ-পরম্পরাগত নিত্যধর্ম বিনষ্ট হলো। হে ভূপালগণ! আমাকে জিতা বা অজিতা যা বোধ করুন, আমি যে প্রশ্ন করেছি তার প্রত্যুত্তর দিন, তৎপরে যা আদেশ করবেন তাই পালন করবো।

মহামতি ভীষ্ম বললেন—

—হে কল্যাণি! ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞরাও তা সম্যক্ নিরূপণ করতে পারেন না। শক্তিধর ব্যক্তি ধর্মানুসারে চলে থাকেন কিন্তু সেই ধর্ম অভিভূত হয়ে অধর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কার্যের সূক্ষ্মত্ব, গহনত্ব, গৌরবত্ব প্রযুক্ত এক্ষণে তোমার এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তর পক্ষে কিছুই নির্ণয় হচ্ছে না, কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হয়েছে, অতএব বোধহয় অচিরাৎ এই বংশ লোপ হবে। তুমি যে কুলের পরিগ্রহ, সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখাভিহত হলেও, কদাপি ধর্ম হতে বিচলিত হলেও কদাপি ধর্ম হতে বিচলিত হন না, অতএব হে পাঞ্চালি! তুমি এইরূপ দুরবস্থগ্রস্ত হয়েও যে ধর্মপথ নিরীক্ষণ করছ, তা তোমার সমুচিতই হয়েছে। এই সমস্ত ধর্মবেত্তা বৃদ্ধ দ্রোণ, কৃপাদি গতাসুর ন্যায় আনত হয়ে শূন্যশরীরে অবস্থান করছেন। এক্ষণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যেরূপ সিদ্ধান্ত করবেন, তাই প্রমাণ হবে। তুমি জিতা বা অজিতা ইনি তা সম্যক নিরূপণ করুন।

সভাস্থ নৃপতি ও পদাধিকারীগণ ব্যাধভয়ভীতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনা দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করে ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভালো-মন্দ কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁদের মৌনতা অবলোকন করে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে বললেন—

—যাজ্ঞসেনি! এইবার তুমি ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, এরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা তোমার জন্য এই আর্যলোকমধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুক এবং যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তোমার দাসীত্বশৃঙ্খল মুক্ত করুক। এই সমস্ত কৌরবেরা তোমার দুঃখে

যৎপরোনাস্তি দুঃখিত। বিশেষত তোমার স্বামীদের দুর্ভাগ্য দর্শন করে এঁরা যথার্থ কথা বলতেই পারলেন না। যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক, তিনি যা করবেন, অবিলম্বে তা প্রতিপালন করবেন। সভাস্থ অনেকেই দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করে ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন, অন্যদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠল। কৌরবেরা ও কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—

—দেখ, ধর্মজ্ঞ কী বলেন এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এঁদেরই-বা কী মত?

কোলাহল কিছুটা কমে এলে ভীমসেন বাহু উত্তোলন পূর্বক বললেন—

—যদি এই উদার স্বভাব কুলপতি ধর্মরাজ প্রভু না হতেন, তাহলে আমরা কখনই ক্ষমা করতাম না। যিনি আমাদের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদি তিনি নিজেকে পরাজিত মনে করেন, তাহলে আমরাও পরাজিত হয়েছি সন্দেহ কী? আমার প্রভুত্ব থাকলে কি পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে এই দুরত্মা এখনও জীবিত থাকতে পারে? ধর্মপাশে বদ্ধ রয়েছি, এইজন্য আমার ভুজবল আজ সকলের প্রত্যক্ষ হলো না। নতুবা আমার ভুজান্তরে নিপাতিত হলে স্বয়ং ইন্দ্রও মুক্ত হতে পারেন না। এখনও যদি ধর্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীগণের প্রাণসংহার করে, সেইরূপ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্তমধ্যে পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করতে পারি।

ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হচ্ছে দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাকে সম্বোধন করে বললেন—

—ভীম! ক্ষান্ত হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নেই, তোমাতে সকলই সম্ভব।

ভীমের ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলে এবং সভা শান্ত হলে কর্ণ দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করে বললেন—

—হে ভদ্রে! এই সভামধ্যে ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণাচার্য এই তিনজন সবল আছেন, এঁরা স্বীয় প্রভুকে দুষ্ট বলে থাকেন। স্ব স্ব ধনবৃদ্ধি করতে বাঞ্ছা করেন কিন্তু তার জন্য ব্যাকুল হন না। দাসের পত্নী ও তার সমুদয় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্বক রাজপরিবারের অনুগত হও। রাজকন্যা! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নয়। এখন তুমি এমন একজনকে পতীত্বে বরণ কর, যে তোমাকে পাশাখেলার পণ রূপে ব্যবহার করে দাসীত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে না। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও

সহদেব দ্যূতে পরাজিত হয়েছে, তুমিও দাসী হয়েছ, ওই পরাজিত পঞ্চ ভ্রাতা এখন আর তোমার স্বামী নয়। যুধিষ্ঠির আপনার জন্মের আবশ্যকতা পরাক্রম ও পৌরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। তিনি এই সভা মধ্যে দ্রুপদ নন্দিনীকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করেছেন।

স্বভাবক্রোধী ভীমসেন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে অধিকতর ক্রোধান্বিত হয়ে আরক্তনয়নে, উষ্ণ নিঃশ্বাস নির্গত করে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—

—হে রাজন, আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইনি। আমরা যথার্থই দাসভাবাপন্ন হয়েছি। কিন্তু আপনি যদি পাঞ্চালীকে পণ রেখে এই কালপাশা না খেলতেন, তবে শত্রুরা এইরূপ কটূক্তি করার দুঃসাহস দেখাতে পারত না।

ভীমের বাক্যে যুধিষ্ঠির লজ্জায়, অপমানে অধোবদন হলেন। যুধিষ্ঠিরের এই পরিণতিতে অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পাশাপাশি দুই মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট হলেন। দুর্যোধন এইবার যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—

—হে নৃপতে! ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত, এক্ষণে বল দ্রৌপদী পরাজিতা হয়েছে কিনা?

ঐশ্বর্যমদমত্ত দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্মরাজকে এরূপ ব্যঙ্গার্থক কথা বলার পর সহাস্যে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

—হে দ্রুপদকন্যা! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছ। এস আমার উরুতে এসে বস।

একথা বলে স্বীয় কদলিবৃক্ষের ন্যায় উরুদেশ বসন মুক্ত করে দ্রৌপদীকে দেখালেন। কর্ণ উচ্চহাস্য করে উঠল। দ্রৌপদী ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত করলেন। ভীমসেন তখন সাতিশয় ক্রোধান্বিত হলেন, তাঁর লোহিতবর্ণ চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হলো। দহ্যমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাঁর রোমকূপ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগল। বজ্রনির্ঘোষে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে রাজগণসমক্ষে বলতে লাগলেন—

—হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে এই উরু ভঙ্গ না করি, তা হলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমান গতি হবে না।

ভীমের ভয়ংকর প্রতিজ্ঞায় সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন বিদুর বললেন—

—হে পার্থিবগণ, ভীমসেন এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করলেন। নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে দৈবই ভরতবংশে এই মহতী অনীতি উৎপাদন করেছেন।

তখনো দ্রৌপদীর দাসীত্ব আদৌ ন্যায়সঙ্গত কিনা এ নিয়ে দুর্যোধন ও অর্জুনের মধ্যে বিতণ্ডা চলছে, কর্ণ ও শকুনি উভয়ে দুর্যোধনকে প্রবলভাবে সমর্থন করছে। তাঁদের এরূপ উত্তরপ্রত্যুত্তর চলছে, এমন সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে সেই দিবাভাগে যুগপৎ শৃগাল ও গদর্ভের দল চীৎকার করতে আরম্ভ করল এবং পক্ষীরা চারদিকে ভয়ানক শব্দ করে উঠল। তত্ত্ববিদ্ বিদুর এবং সতী গান্ধারী সেই অমঙ্গলজনক শব্দে স্পষ্ট বিপদের আভাষ পেলেন।

দূরদর্শী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য এই অমঙ্গলসূচক শব্দশুনে 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' বলতে লাগলেন। এই ঘোরতর উৎপাত দর্শনে সাতিশয় ভীত হয়ে বিদুর ও গান্ধারী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণে আতঙ্কিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলেন।

—হে দুর্বিনীত দুর্যোধন। তোর পাপে এই মহান বংশ ধ্বংস হবে। যেহেতু কুরুকুলকামিনী বিশেষত পাণ্ডবদের সহধর্মিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করছিস্। অতঃপর দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা বাক্যে তুষ্ট করে বললেন—

—ভদ্রে! তুমি আমার নিকট সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী বললেন—

—হে ভরতকুল প্রদীপ। যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে সর্বধর্মযুক্ত যুধিষ্ঠিরকে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করলাম। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। তুমি শুধুমাত্র এক বরের উপযুক্ত নও।

দ্রৌপদী বললেন—

—মহারাজ যদি কৃপা করেণ, তবে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করলাম। এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর প্রদানে তোমার যথোচিত সৎকার হয়নি। তুমি ধর্মচারিণী, আমার সমুদয় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

দ্রৌপদী বললেন—

—হে ভগবান! লোভ ধর্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করব না। আমার পতিগণ দাসত্বরূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়ে আপনার কৃপাবশে পুনরায় উত্থিত হলেন, এঁরা পুণ্যকর্মদ্বারা শ্রেয়োলাভ করতে পারবেন।

পিতার এই উদারতায় পুত্র দুর্যোধন অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কর্ণও নিরাশ হলেন, তথাপি বললেন—

—ইতিপূর্বে আমরা যে সকল অসামান্য রূপবতী কামিনীদের কথা শ্রবণ, তন্মধ্যে কোনো রমণীর এতাদৃশ কর্ম শ্রুতিগোচর হয়নি। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই সমধিক ক্রোধপরতন্ত্র হয়েছিলেন, এক্ষণে দ্রৌপদী শস্ত্রমধ্যে শান্তিস্বরূপা হলেন।

কর্ণের এই বাক্যে ভীম আবার কুপিত হলে অর্জুন ও যুধিষ্ঠির তাঁকে নানা যুক্তি দিয়ে শান্ত করলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—

—হে রাজন! এখন আমাদের কী কর্তব্য অনুমতি করুন। আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অনুবর্তী হয়ে থাকতে ইচ্ছা করি।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—হে অজাতশত্রু! তোমাদের কল্যাণ হোক। আমি আদেশ দিচ্ছি, তোমরা গমন করো, সমস্ত ধন নিয়ে গমনপূর্বক নিজ রাজ্য শাসন কর। তোমাতে ধর্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা এবং গুরু শুশ্রূষা বিলক্ষণ লক্ষিত হচ্ছে, অতএব হে বৎস! তোমাদের কল্যাণ হবে, তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে গমন কর। ভ্রাতাদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব এবং তোমার মন ধর্মে অনুরক্ত হোক।

যুধিষ্ঠির তখন শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ মেঘসঙ্কাশরথে আরোহণ করে হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করলেন।

যুধিষ্ঠিরাদির সবিত্ত ও সসম্মানে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন, দুর্যোধন ও কর্ণ, শকুনিরা কিছুতেই মানতে পারলেন না। ভীমের প্রতিজ্ঞা দুর্যোধনকে ভয়ানকভাবে সন্ত্রস্ত করেছে। তাঁরা বৃদ্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে পাণ্ডবদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে লাগলেন যাতে স্নেহান্ধ মহারাজের মনে আশঙ্কা ও ভয়ের সৃষ্টি হলো।

কর্ণ বললেন—মহারাজ! আমাদের কাছে পরাজয় ও অপমানের গ্লানি পাণ্ডবরা ভুলতে পারবে না, আর তারা আমাদের ক্ষমা করবে না। বিশেষত দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা যে কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে তা নিশ্চিত। এক্ষণে পাণ্ডবদের ক্রোধ থেকে অব্যাহতির একমাত্র পথ পুনরায় দ্যূতক্রীড়া। পাণ্ডবদের আহ্বান করে আরেকবার পণ রেখে দ্যূতক্রীড়া হোক। এবারের পণ হবে পরাজিত পক্ষের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস। যে পক্ষ পরাজয় বরণ করবে তারা সপরিবারে বারো বছরের জন্য বনে গমন করবে এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকবে। আমাদের পক্ষ পরাজিত হলে আমরা সপার্ষদ বনে গমন করব আর পাণ্ডবপক্ষ পরাজিত হলে তারাও সপরিবারে বনে গমন করবে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—বৎসগণ! তোমরা অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে বার্তা দাও, তারা এসে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হোক।

রাজার এই বাক্য শোনামাত্র দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, বিদুর, সোমদত্ত, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ প্রমুখ সমস্বরে পুনরায় দ্যূতক্রীড়া আয়োজনের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু পুত্রপ্রেমে অন্ধরাজা অর্থবশী সুহৃদ বর্গকে অনাদর করে পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করলেন। সতীসাধ্বী গান্ধারীর আবেদনও অগ্রাহ্য করলেন ধৃতরাষ্ট্র।

পাণ্ডবরা পুনরায় আহূত হয়ে হস্তিনাপুরে আগমন করলেন। আবার সেই দ্যূতগৃহে ক্রীড়া শুরু হলো। পণ একটাই—পরাজিত পক্ষের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং একবর্ষ অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের মধ্যে পরিচয় প্রকাশ পেলে আবার দ্বাদশবর্ষ বনবাস।

শুরু হলো ক্রীড়া। একপক্ষে যুধিষ্ঠির, অপর পক্ষে সুবলনন্দন শকুনি। আবার সেই কপট পাশায় জয়ী হলো শকুনি। যুধিষ্ঠির সপরিবারে চললেন বনবাসে। মাতা কুন্তী ধর্মাত্মা বিদুরের আশ্রয়ে। পাণ্ডবদের রাজ্যের দায়িত্ব নিলেন আচার্য দ্রোণ। পুরবাসীদের হাহাকার ও বিলাপের মধ্য দিয়ে অরণ্যের পথে এগিয়ে চলেছেন পাণ্ডবগণ। চলেছেন রাজনন্দিনী রাজরাজেশ্বরী দ্রৌপদী। পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের সীমানা অতিক্রম করা মাত্র বিনামেঘে বজ্রপাত, অসময়ে সূর্যগ্রহণ, উল্কাপাত হতে লাগল। গর্দভ, শেয়াল, শকুন, বায়স প্রচণ্ড নিনাদে কোনও অশুভ বার্তা প্রেরণ করতে লাগল। ভীষ্ম ও বিদুর এই অশুভলক্ষ্মণ যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিতার ভরতকুল বিনাশের ইঙ্গিত এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এই সময়ে মহর্ষি পরিবৃত দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হয়ে এক ভয়ঙ্কর বাক্য শোনালেন— আজ থেকে চতুর্দশ বর্ষে দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জুনের শক্তিতে এই কুরুকুল নির্মূলিত হবে।

কুরুবংশ ধ্বংসের এই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দেবর্ষি অন্তর্ধান করলেন।

* * * * *

মুনি ঋষিদের সান্নিধ্যে কাম্যকবনে কুটীর নির্মাণ করে বাস করছেন দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডব। নিত্য যাগ্‌যজ্ঞ, ধর্মালোচনা, বেদপাঠ— এক অনির্বচনীয় আনন্দে দিন কাটছে পাণ্ডবদের। এখানে হিংসা নেই, রাজনীতির কুটিলতা নেই, বিশ্বাসঘাতকতা নেই। এইভাবে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত। এক মধ্যাহ্নে সেই তপোস্থলীর অদূরে শোনা গেল নগরের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। যেন কোনো সেনাদল তপোভূমি আক্রমণ করতে আসছে। ভীম ও অর্জুন সশস্ত্র হয়ে অগ্রসর হতে চাইলে যুধিষ্ঠির নিষেধ করে বললেন—

—যদি তপোভূমি আক্রান্ত হয় তবে তোমরা প্রতিরোধ করবে। তার আগে তোমরা আক্রমণ করতে যেও না।

কিয়ৎকাল পরে হস্তিনাপুরবাসী কিছু নাগরিক অনেক সন্ধান করে যুধিষ্ঠিরের কাছে হস্তিনাপুরের অন্তঃপুরবাসিনীদের এক

জরুরি বার্তা নিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রমুখ রাজপুরুষেরা অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে এই বনে বিহার করতে এসেছিলেন। এক সরোবরের সাময়িক অধিকার নিয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে তাঁদের কলহ শুরু হয়। যার ফল যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। মহাবীর কর্ণ গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। দুর্যোধন ও অন্যান্য কুরুবীররা অন্তঃপুরিকারা-সহ গন্ধর্বদের হাতে বন্দি। মহারানি ভানুমতি তাঁদের উদ্ধারের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাহায্য প্রার্থনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন।

দূতমুখে দুর্যোধনের এই পরিণতির কথা শুনে ভীম অত্যন্ত উৎফুল্ল হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং সহসা কুলবধূদের উদ্ধারের জন্য অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সশস্ত্র করে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। ভীম অর্জুনের বীরত্বের কাছে অচিরেই গন্ধর্বরা পরাজিত হলো। অর্জুনের মিত্র চিত্রসেন দুর্যোধনের অনেক কুকীর্তির কথা প্রকাশ করলেন এবং শেষপর্যন্ত অর্জুনের অনুরোধে কুলকামিনীগণ-সহ কৌরবগণকে মুক্তি দিলেন। মুক্ত হয়ে দুর্যোধন কর্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং এই অপমানের জন্য আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কর্ণ অনেক নীতিবাক্য শুনিয়ে তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করলেন। অপ্রসন্ন মনে তাঁরা রাজধানীতে ফিরে এলেন।

হস্তিনাপুরে ফিরে কর্ণ নিজ রাজ্য অঙ্গদেশে গমনের জন্য দুর্যোধনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং অনুমতি পেয়ে রথে দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা করে অতি শীঘ্র অঙ্গদেশে পৌঁছে গেলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষসেনের উপর রাজ্যভার। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদপুষ্ট বৃষসেন বিজ্ঞমন্ত্রীদের সুপরামর্শে রাজ্যশাসন করে প্রজাদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য পেয়েছেন। অনুজ চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুষেন অগ্রজের চির অনুগত। সত্যের পূজারি কর্ণকে অধিকাংশ সময় হস্তিনাপুরে থাকতে হয়। আপন পরাক্রমে কর্ণ একের পর এক রাজ্য জয় করেছেন। কৌরবদের রাজ্যে পদার্পণের অনুমতির জন্য কর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে মহারানি গান্ধারী ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের চরণ বন্দনা করলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিপূর্বক কর্ণকে আলিঙ্গন করে গমনের অনুমতি দিলেন। বললেন —শকুনি সেই থেকে এটা স্থির করেছিল যে, মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করে রেখেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

পাণ্ডবদের সঙ্গে কর্ণের নিজের কোনও শত্রুতা নেই, বরং ধীর, স্থির, তেজস্বী পাণ্ডবদের কর্ণ শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের সঙ্গে শত্রুতার কারণ দুর্যোধন। একমাত্র দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করার জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা। সহায় সম্বলহীন সূতপুত্র কর্ণকে দুর্যোধন রাজ্য দান করেছেন, রাজার সম্মান দিয়েছেন। তাঁর আত্মার আত্মীয় করে নিয়েছেন। দুর্যোধনের সন্তুষ্টির জন্য কর্ণ সব কিছুই করতে পারেন, এমনকী হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জনও করতে পারেন। প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়েছেন কর্ণ। রাত্রি প্রথম প্রহর, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় স্নাত ধরণী, দূরে কোকিল ডাকছে, গন্ধে আমোদিত প্রাসাদ অঙ্গন। হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে কার কোমল করস্পর্শ অনুভব করলেন কর্ণ। চেয়ে দেখেন পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রী পদ্মাবতী।

—পদ্মা!

—কতদিন পর এলে বলতো?

—কী জানি, বেশ কয়েক বছর হবে।

—ওই দুর্জনের সান্নিধ্য আপনার ভালো লাগে?

—না।

—তবে?

—কৃতজ্ঞতা, দায়বদ্ধতা, কর্তব্য।

নির্মল আকাশে হঠাৎ এক মেঘখণ্ড পূর্ণ চন্দ্রকে ঢেকে দিল।

* * * * *

পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হতে চলল। এবার তাঁদের যেতে হবে এক বছরের অজ্ঞাতবাসের নিরাপদ আশ্রয়ে। মৎস্যরাজ বিরাট সর্বদা পাণ্ডবদের অনুগামী। ধর্মের বরে পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে বিরাট রাজের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তাঁর আগে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সযত্নে রক্ষিত হলো এক শ্মশানের পার্শ্বস্থিত শমীবৃক্ষে। গুজব রটিয়ে দেওয়া হলো ওই শমীবৃক্ষে ভয়ংকর ব্রহ্মদৈত্যের বাস। লোকজন ভয়ে ওদিকপানে যেত না।

যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে দ্যূতকার বেশে বিরাট রাজসভায় প্রবেশ করেন। ভীম পাচকরূপী বল্লভ নামে, অর্জুন নারী বেশধারী বৃহন্নলা রূপে। নকুল অশ্বপালক এবং গোপবেশে সহদেব গোরক্ষক রূপে বিরাট সভায় প্রবেশ করে। দ্রৌপদী পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রী রূপে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্মনৈপুণ্যে অচিরেই রাজ আনুগত্য অর্জন করেন। সবই ঠিকঠাক চলছিল। সমস্যা হলো সৈরিন্ধ্রীর অন্তরালে দ্রৌপদীকে নিয়ে। রাজশ্যালক কীচক বিরাট রাজ্যের সেনাপতি। রানির প্রশ্রয়ে অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি। সেই দুশ্চরিত্র কীচকের নজর পড়ল দ্রৌপদীর দিকে। দ্রৌপদীকে পাওয়ার জন্য কীচক পাগল হয়ে উঠল। কোনো অজুহাতে যখন তাকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না তখন দ্রৌপদী সব কথা প্রকাশ করল বল্লভরূপী ভীমসেনের কাছে। ভীমসেনের পরামর্শে দ্রৌপদী সেই রাতে কীচককে আহ্বান করল প্রাসাদের নৃত্যশালায়। সেখানে আগে থেকেই দ্রৌপদীর পোশাক পরিধান করে অপেক্ষা করছিল বল্লভরূপী ভীম। অন্ধকারে কীচক দ্রৌপদী ভেবে ভীমের কাছে যেতেই ভীম তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। পরদিন সকালে প্রচারিত হয় সৈরিন্ধ্রীর রক্ষক যক্ষই কীচককে হত্যা করেছে।

কীচকের অনুচরেরা সৈরিন্ধ্রী কীচকের মৃত্যুর জন্য দায়ী এইরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কীচকের মৃতদেহের সঙ্গে সৈরিন্ধ্রীর দেহকে রজ্জুদ্বারা বেঁধে এক সঙ্গে দাহ করার উদ্দেশ্যে শ্মশানভূমির দিকে যাত্রা করে। এই সংবাদ পেয়ে ভীম এক বিশাল পাদপ মূল-সহ উৎপাটন করে তার প্রহারে কীচক অনুচরদের নিহত করে দ্রৌপদীকে মুক্ত করেন। দ্রৌপদী আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। তৎক্ষণাৎ রানি সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে রাজাদেশ জানিয়ে দেন যে তাঁকে এই মুহূর্তেই প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে, কারণ রাজা গন্ধর্বদের ভয়ে ভীত হয়ে আছেন সৈরিন্ধ্রী প্রাসাদে থাকলে আবারও কোনো বিপদ ঘটতে পারে। সৈরিন্ধ্রী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আর মাত্র ত্রয়োদশ দিন প্রাসাদে অবস্থানের প্রার্থনা জানালেন।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের সময়সীমা প্রায় শেষ। পাণ্ডব সন্ধানে কৌরবের অনুসন্ধানকারী দল চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে কিন্তু কোথায় পাণ্ডবরা তারা যেন পৃথিবীর বাইরে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। এই সময়ে একদিন ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মা সসৈন্য বিরাট রাজের বিখ্যাত গোশালা আক্রমণ করে অনেক গোধন অপহরণ করে। সেনাপতি নেই, রাজা বিরাট কিংকর্তব্য বিমূঢ়। এই সময়ে রাজাকে আশ্বস্ত করে পাশে দাঁড়ালেন তাঁর আশ্রিত কঙ্ক, পাচক বল্লভ, অশ্বপাল নকুল এবং গোপাল সহদেব। রথ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মৎস্যরাজকে অগ্রভাগে রেখে তাঁরা যুদ্ধযাত্রা করলেন। সুশর্মা মৎস্যরাজকে একা দেখে এক ঝটিকা আক্রমণে তাঁকে পরাজিত ও বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে আদেশ দিলেন দ্রুত মৎস্যরাজকে উদ্ধার করার জন্য। ভীম যথারীতি পাদপ উৎপাটন করতে গেলে যুধিষ্ঠির তাঁকে নিষেধ করে বললেন—

—এই কাজটি করিও না। তাহলে লোকের সন্দেহ হবে ভীমসেন ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এই যুদ্ধ সম্ভব নয়। তুমি স্বাভাবিক অস্ত্রশস্ত্র ও রথ নিয়ে মৎস্যরাজকে উদ্ধার করে নকুল ও সহদেব তোমাকে সাহায্য করবে। ভীমের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সুশর্মা পর্যুদস্ত হয়ে বিরাটরাজকে রথোপরি রেখে নিজে পলায়ন করছে, ভীম পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে বন্দি করেন। যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব তীব্র আক্রমণে সুশর্মার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। অসংখ্য হতাহত এবং অবশিষ্ট সৈন্যরা পলায়ন করে। এত দ্রুত জয় করায়ত্ত হবে মৎস্যরাজ ভাবতেও পারেননি। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে কঙ্ক, বল্লভ এবং অশ্বপাল ও গোপালকে নিয়ে বন্দি সুশর্মা ও উদ্ধারকৃত গোধনসমূহ নিয়ে বিজয়ীর বেশে রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে বিরাট নগরে তখন আর এক হাহাকার। দুর্যোধন প্রধান প্রধান কুরুযোদ্ধাদের নিয়ে এসেছে বিরাট রাজ্যের বিখ্যাত গোশালা থেকে গোধন হরণ করতে। কে নেই সেই গো-তস্করদের দলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা সবাই। বিরাটের সৈন্যদল তখন সুশর্মার আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং গোরক্ষা করতে ব্যস্ত। রাজপ্রসাদ রক্ষার দায়িত্ব কুমার উত্তরের। এই সময়ে ভীত সন্ত্রস্ত গোরক্ষকেরা প্রাসাদে এসে সংবাদ দিল কৌরব সেনারা গোশালা আক্রমণ করে গোরক্ষকদের আহত অথবা হত্যা করে ষাট হাজার গোধন অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তেজিত উত্তর বার বার বলতে লাগল যদি একজন সারথি থাকত তবে যুদ্ধ করে গৌরবদের হাত থেকে গোধন উদ্ধার করতে পারত। তখন সৈরিন্ধ্রী বললেন—বৃহন্নলা একজন উত্তম সারথি। পাণ্ডবদের সঙ্গে বহুযুদ্ধে রথ চালনার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। তিনি অনায়াসে তোমার রথের সারথি হতে পারেন।

উত্তর সম্মতি দিলে বৃহন্নলারূপী অর্জুন রথে অস্ত্রসন্নিবেশ করে অতি দ্রুত অশ্ব সঞ্চালনে কুরু সৈন্যদের সামনে রথ স্থাপন করলেন। কিন্তু রণে অনভিজ্ঞ বালক উত্তর বিশাল কৌরব বাহিনী দেখে ভীত হয়ে সারথিকে রথ ঘুরিয়ে প্রাসাদে ফিরে যেতে বললেন। উত্তরের মনোভাব অবগত হয়ে ধনঞ্জয় বললেন— যুবরাজ! আপনি যদি সারথি হয়ে রথ চালনা করতে পারেন তবে আমি কৌরবদের কাছ থেকে গোধন উদ্ধার করতে পারি। গোধন অপহৃত হলে আপনার অপযশ।

উত্তর রথ চালনায় সম্মত হলে বৃহন্নলা প্রথমে শ্মশানের শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্রগুলি নামিয়ে নিলেন। অতঃপর গাণ্ডীবে শর যোজনা করে শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন। উত্তরের সারথি হয়ে বৃহন্নলা যখন প্রথম রণক্ষেত্রে যান তখন কুরু যোদ্ধাদের অনেকের সন্দেহ হয় এই সারথি অর্জুন নয়তো? এইবার যোদ্ধা রূপে বৃহন্নলাকে দেখলেন। সবার মনে একটাই প্রশ্ন—কে এই যোদ্ধা?

কর্ণের স্পষ্ট উক্তি—

—মৎস্যরাজই আগমন করুন অথবা ধনঞ্জয়ই আসুক, আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে, আমি এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথীগণ এসময়ে কেন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে রথোপরি দাঁড়িয়ে আছেন? বিনা যুদ্ধে কারও নিস্তার নেই। যদি কোনও বজ্রধর বা দণ্ডধর বলপূর্বক আমাদের বিজিত গোধন হরণ করেন, তথাপি কোন ব্যক্তি বিনাযুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করবেন? পদাতিক হোক বা অশ্বারোহী, সমরে পরাঙ্মুখ হলে কেউ আমার শরে জীবিত থাকবে না। পাণ্ডবগণ বিশেষত অর্জুন আচার্যের সবিশেষ প্রিয় পাত্র, আগত যোদ্ধাকে অর্জুন কল্পনা করে আচার্য এত বিহ্বল হয়েছেন যে তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করেছেন। বিপক্ষের অনুরাগী সমরনায়কদের উপেক্ষা করে শত্রুসংহার উপযোগী নীতি প্রয়োগ করুন, চতুর্দিকে এরূপ ব্যূহ রচনাপূর্বক মধ্যস্থানে গোসমূহ সংস্থাপিত করে সযত্নে রক্ষা করুন, যাতে আমরা

অনায়াসে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি।

কর্ণের এই উদ্দীপনাময় বাক্যেও মহারথীদের মধ্যে যেন কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। প্রায় সকলেরই দৃষ্টি দূরে রথোপরি সেই অর্জুনসদৃশ যোদ্ধার দিকে। প্রত্যেক মহারথীর চোখেমুখে বিস্ময়, কৌতূহল। কুরুবীরদের এই আচরণে কর্ণ ক্ষুব্ধ হলেন। দুর্যোধনের ইপ্সিত কোনো কর্ম বিঘ্নিত হোক কর্ণ তা মন থেকে মানতে পারেন না সে যত অন্যায় কাজই হোক না কেন। কর্ণ সম্যক জানেন দুর্যোধন শঠ, প্রবঞ্চক, লোভী, দাম্ভিক, হিংস্র, পরশ্রী কাতর, তথাপি দুর্যোধন কর্ণের কাছে দেবতা। অজ্ঞাত কুলশীল সূতপুত্র কর্ণকে দুর্যোধন রাজ্য দিয়েছেন রাজকীয় মর্যাদা দিয়েছেন, তাই শুধুমাত্র দুর্যোধনের সন্তুষ্টির জন্য কর্ণ সবকিছু করতে পারেন, তা যত বড় অধর্মই হোক না কেন? এই এক অদ্ভুত রণক্ষেত্র এখানে কোনো রণহুংকার নেই। কোলাহল নেই। কুরুপক্ষীয় সব যোদ্ধারাই যেন চিত্রার্পিতের মতো তাকিয়ে আছে একমাত্র বিপক্ষীয় রথীর দিকে। সেই মহরথীও যেন হিংসা ভুলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন কুরুপক্ষীয় মহরাথীদের দিকে দৃষ্টিতে ক্রূরতা নেই, আছে শ্রদ্ধা।

হুংকার দিয়ে উঠলেন কর্ণ—

—কী আশ্চর্য! সব ধনুর্ধরকেই ভীত ও সমরপরাঙ্মুখ দেখছি। ওই যোদ্ধা মৎস্যরাজই হোক বা অর্জুন হোক তাকে ভয়ের কী আছে? বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে রুদ্ধ করে রাখে, সকলে নিশ্চিন্ত থাকুন আমি একাই তাকে অবরোধ করবো। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলো, অর্জুন আমাকে সমরে পরাজিত করার জন্য একান্ত উৎসুক হয়েছে। আজ এই সংগ্রামে সাতিশয় উৎসাহ সহকারে অবশ্যই আমাকে প্রহার করবে, তাতে সন্দেহ নেই। মহাবীর ধনঞ্জয় আমার নিশ্চিত শরসমূহ প্রয়োগ করার উপযুক্ত পাত্র। এই মহাবলপরাক্রান্ত ধনুর্ধর ত্রিলোকবিশ্রুত। আমিও তার থেকে কোনো অংশে কম নই। আজ আকাশমণ্ডল আমার বাণে সমাচ্ছন্ন হয়ে অতিকায় বিহঙ্গের স্বর্ণময় পক্ষবিস্তার বলে বোধ হবে।

আজ আমি সমরে অর্জুনকে সংহার করে দুর্যোধনসমীপে পূর্বপ্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করব। মাহুত অঙ্কুশদ্বারা যেমন মহাগজকে নিপীড়িত করে অদ্য যুদ্ধে আমি মহেন্দ্র সমতেজা ধনঞ্জয়কে বাণ দ্বারা ব্যথিত করব। গরুড় যেমন সর্পকে অনায়াসে গ্রহণ করে, তদ্রূপ আজ আমিও সর্বাস্ত্রবেত্তা অতিরথ পার্থকে আক্রমণ করব। যেমন সৌদামিনীর নাথ জলধর পটল অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে প্রবল হুতাশনকে নির্বাপিত করে, সেইরূপ আমিও অদ্য রথারোহণপূর্বক শরজালদ্বারা সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়কে সংহার করব। আজ আমি রথ থেকে অর্জুনকে নিপাতিত করে দুর্যোধনের চিরনিহিত হৃদয়শল্য সমূলে উৎপাটিত করব। আজ কৌরবগণ পুরুষাকারসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে হতাশ্ব ও বিরথ হয়ে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে দেখবেন। এক্ষণে তাঁরা গোধন নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান অথবা স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্বক আমার রণনৈপুণ্য দর্শন করুন।

কৌরব বীরগণ কর্ণের এই আস্ফালনের প্রত্যুত্তর করলেন না। কেবল কৃপাচার্য অগ্রণী হয়ে মৃদু প্রতিবাদ করলেন।

—হে কর্ণ! ক্রূর যুদ্ধে তোমার নিপুণতা আছে এবং কীরূপে মন্ত্রণা করতে হয়, তাও তোমার অবিদিত নেই, কিন্তু উত্তরকালে কী ফল হবে তার কিছুমাত্র পর্যবেক্ষণ কর না। শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হয়েছে বটে কিন্তু পণ্ডিতগণ ওই সমুদয় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলে কীর্তন করেছেন। উপযুক্ত দেশকাল পর্যালোচনা করে যুদ্ধ করলে জয়লাভ হয়। কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করলে কখনও জয়লাভ হয় না।

যাহোক, এক্ষণে মহাভয় সমুপস্থিত অতএব দ্রোণ, ভীষ্ম, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা তুমি ও আমি এই ছয়জন রথী প্রস্তুত হয়ে থাকি সকলে একত্র হয়ে অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রাম করব। একাকী যুদ্ধ করব বলে বৃথা সাহস ও দর্প করার আবশ্যকতা নেই। সৈন্যসমুদয় ও প্রধান প্রধান ধনুর্ধরগণ বর্মধারণ ও ব্যূহ রচনা করে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক সাবধান হয়ে থাকুক। পূর্বে দানবগণ বাসবের সঙ্গে যেরূপ সংগ্রাম করেছিল অজুর্নের সঙ্গে আমাদের সেই রকম সমর হবে সন্দেহ নেই।

ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রমুখ গৌরব মহারথীগণও কর্ণের এই আস্ফালন সমর্থন করলেন না। ভীষ্ম বললেন—

—মহামতি কৃপ ও অশ্বত্থামা অতি উত্তম বলেছেন। কর্ণ ক্ষাত্রধর্মাবলম্বন পূর্বক কেবল যুদ্ধ করার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন। আর আচার্য যা বলেছেন সে সম্বন্ধে দোষারোপ করা বিজ্ঞব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আমার মতে উত্তম রূপে দেশ-কাল পর্যালোচনা করে যুদ্ধ করাই কর্তব্য। হে দুর্যোধন, এবিষয়ে আমার মত শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধাদের উত্তেজিত করার নিমিত্তই সমর বাসনা প্রকাশ করেছেন, অতএব আচার্য দ্রোণ, কৃপ ও আচার্যপুত্রের এবিষয়ে ক্ষমা করা কর্তব্য এবং তোমারও এতে সবিশেষ বিবেচনা করা বিধেয়। এক্ষণে মহৎ কার্য সমুপস্থিত, অর্জুন আগতপ্রায়, অতএব আমাদের সকলেরই একত্র হয়ে যুদ্ধ করা উচিত এক্ষণে পরস্পর বিরোধ করার সময় নয়।

তখন আচার্য দ্রোণ বললেন—

—শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পূর্বে যা বলেছেন আমি তাতে সহমত পোষণ করি। হে গাঙ্গেয়! এক্ষণে পার্থ যাতে দুর্যোধনকে আক্রমণ করতে না পারে, যাতে মহারাজ দুর্যোধন সাহস বা মোহবশত শত্রুর বশীভূত না হন এই বিষয়ে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত না হলে অর্জুন কদাচ আত্মপ্রকাশ করত না। ওই মহাবীর এক্ষণে গোধন উদ্ধার করতে এসেছে, সে কাউকে ক্ষমা করবে না। অতএব যাতে

অর্জুন মহারাজ দুর্যোধন ও এই সকল সৈন্যকে পরাজিত করতে সমর্থ না হয় এ বিষয়ে নিয়ম নির্ধারণ করা।

ভীষ্ম বললেন—

—কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু ও সংবৎসর নিয়ে এক একটি 'কালচক্র' হয়। এদের কালাতিকের ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের ব্যতিক্রম বশত প্রতি পঞ্চমবর্ষে দুই মাস করে বৃদ্ধি হয়। এইরূপে তাদের ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হয়ে পাঁচ মাস ছয়দিন অধিক হয়েছে। তারা যা যা প্রতিজ্ঞা করেছিল তা পূর্ণ হয়েছে জেনে অর্জুন সমাগত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

—দুর্যোধন বললেন—

—পিতামহ! আমি কদাচ পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন।

ভীষ্ম বললেন—

—হে কুরুনন্দন! যতে তোমাদের শ্রেয় লাভ হয়, ঈদৃশ উপদেশ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য। আমার অভিপ্রায়ে শ্রবণ করো। তুমি সমস্ত সৈন্যকে চারভাগে বিভক্ত করে তার একভাগ নিয়ে নগরে প্রস্থান কর, অপর এক ভাগ গোধন নিয়ে গমন করুক। পরে কৃপ, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই ভাগ সৈন্য নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

পিতামহ ভীষ্মের বাক্য সকলে নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন। কুরুরাজ দুর্যোধন তন্নির্দিষ্ট সুমদয় কার্য সম্পাদন করলেন। ভীষ্ম প্রথমে দুর্যোধন, পরে গোধনসমূহ, যথাযথ গন্তব্যে সৈন্য বেষ্টন করে প্রেরণ করলেন। অতঃপর ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে দ্রোণকে সম্বোধন করে বললেন—

—আচার্য! আপনি মধ্যস্থানে অবস্থান করুন, অশ্বত্থামা বামপার্শ্ব ও কৃপাচার্য দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করবেন। সূতপুত্র কর্ণ অগ্রসর হবেন এবং আমি পশ্চাদ্‌ভাগে থেকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব।

তখন দ্রোণাচার্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—

—এই দেখ, দূরে মহাবীর অর্জুনের রথের ধ্বজাগ্রভাগ শোভা পাচ্ছে, ধনঞ্জয় সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক মুহুর্মুহু গাণ্ডীব শরাসনে অশনিনির্ঘোষ সদৃশ টঙ্কার প্রদান করছে।

অর্জুনের এখন লক্ষ্য একমাত্র দুর্যোধন। অর্জুনের নির্দেশে উত্তর যেদিকে গোধন-সহ দুর্যোধন গমন করেছে সেইদিকে রথ চালনা করলেন। অচিরেই অর্জুন অপহৃত গোধন সমূহকে মুক্ত করে মৎস্যরাজ্যের গোশালার দিকে ধাবিত করলেন এবং স্বয়ং দুর্যোধনের দিকে ধাবমান হলেন। উত্তরকে লক্ষ্য করে বললেন—

—ওই দেখ, সূতপুত্র কর্ণ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় আমার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য সমুদ্যত হয়েছে। ওই দুরাত্মা দুর্যোধনের আশ্রয় বলে একান্ত দর্পিত। তুমি সত্বর ওই নরাধমের কাছে আমাকে নিয়ে চল। উত্তর দক্ষ সারথির ন্যায় অতি দ্রুত অশ্বসমুদয় চালনা পূর্বক শত্রুসৈন্য বিনাশপূর্বক রণস্থলে ধনঞ্জয়কে উপনীত করলেন। তখন কর্ণের সহযোগী যোদ্ধারা অর্জুনের উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগল। এই যোদ্ধারা অর্জুনের শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে বায়ুবেগে বিকম্পিত মহাবনের ন্যায় আলোড়িত হয়ে উঠল। ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী হিমালয়জাত মহাগজতুল্য পরাক্রান্ত সুবেশধারী বীরগণ পার্থশরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক পৃথ্বীতলে শায়িত হলো।

তখন কর্ণ ক্রোধভরে অর্জুনের সমীপবর্তী হয়ে দ্বাদশবাণ দ্বারা তাঁর অশ্ব, সারথি এবং স্বয়ং অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। আহত অর্জুন সহসা কর্ণের সমীপবর্তী হয়ে শরবর্ষণ দ্বারা তাঁর রথের অশব সারথিকে ভূপাতিত করে কর্ণকে শরজালে আচ্ছন্ন করলেন। অর্জুনের প্রচণ্ড বাণ বর্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহারথীদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বহুতর শরনিক্ষেপ দ্বারা পার্থের সমুদয় বাণ প্রতিহত করে অগ্নিবাণ দ্বারা পার্থকে আচ্ছাদিত করলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হয়ে নানাবিধ বাদ্য সহকারে কর্ণের প্রশংসা করতে লাগল। অর্জুন তখন বরুণবাণ দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করে ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য যোদ্ধাদের আক্রমণ করলেন। বারিধারার মতো শরবর্ষণে কর্ণের অশ্ব সারথিকে পুনরায় ভূপাতিত করলেন। কর্ণও বিবিধ সায়ক দ্বারা অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। এই যুদ্ধে দুই বীরকে মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র সূর্যের ন্যায় বোধ হতে লাগল।

কর্ণ সত্বর অর্জুনের রথের অশ্বগুলিকে পুনরায় বাণবিদ্ধ করে সারথির উপর তিন শর এবং ধ্বজের উপর তিন শর নিক্ষেপ করলেন। তখন ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হয়ে শরনিক্ষেপ দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদন পূর্বক তূণীর থেকে নিশিত ভল্ল নিষ্কাশিত করে ত্বরায় কর্ণের গাত্রে বিদ্ধ করলেন। পরে সুশাণিত শরজাল দ্বারা সুতপুত্রের বাহু, শির, উরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করলে গজ যেমন অন্য গজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কর্ণ অশনিসন্নিভ শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হয়ে রণ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করলেন।

কর্ণ প্রস্থান করলে দুর্যোধন প্রমুখ বীরপুরুষগণ স্ব-স্ব সৈন্য-সমভিব্যাহারে পার্থকে আক্রমণ করে চর্তুদিক থেকে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। নির্ভীক পার্থ সহাস্যবদনে বেলাভূমির ন্যায় সমুদ্র-সদৃশ কৌরবসেনার বেগ ধারণ করে দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন।

অস্তকাল উপস্থিত হলে দিবাকরও বিশ্রাম করে থাকেন, কিন্তু মহাবীর অর্জুন কদাচ সমরে নিবৃত্ত হন না। তিনি সেই সমস্ত কুরুবীরদের লক্ষ্য করে অনবরত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রমুখ বীর

কখনো এককভাবে বা কখনো সমবেতভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন এবং বারংবার পরাজিত হয়ে প্রস্থান করলেন। এই সময়ে কর্ণ পুনরায় রণক্ষেত্রে আগমন করে উৎকৃষ্ট কার্মুক আকর্ষণপূর্বক অর্জুনের প্রতি শরবৃষ্টি করতে লাগলেন। রণস্থলে সহসা হাহাকার শব্দ উত্থিত হলো। অর্জুন তখন ইতস্তত দৃষ্টিপাত করামাত্র কর্ণকে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ দেখে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন এবং জিঘাংসাপরবশ হয়ে আরক্ত নেত্রে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধ অভিলাষে তাঁকে বললেন—

—হে কর্ণ! ভূমিতলে তোমার সদৃশ যোদ্ধা নেই বলে তুমি পূর্বে সভামধ্যে সাতিশয় অহংকার প্রকাশ করেছিলে। এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত, একবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাহলে তুমি আপনার পরাক্রম জানতে পারবে অন্যের অবমাননায় আর কদাচ প্রবৃত্ত হবে না। তুমি আমার অসমক্ষে সে সকল কথা বলেছিলে আজ কৌরব সমক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে দেখাও। এই দুরাত্মারা যখন পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণপূর্বক সভামধ্যে নিগ্রহ করেছিল তখন তা নিষ্পত্তি না করে অনায়াসে তাঁর সেই দুরবস্থা অবলোকন করেছিলে, আজ তার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। ধর্মপাশে বদ্ধ ছিলাম বলে পূর্বে ক্ষমা করেছি, আজকের যুদ্ধে সেই ক্রোধের প্রত্যক্ষ ফল অবলোকন করবে।

কর্ণ তখন বললেন—

—পার্থ! কথায় যা বললে, তা কাজে করে দেখাও। অনর্থক বাক্যব্যয় করে কী হবে? তুমি প্রতিজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশবর্ষ বনে বাস করে সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েছ, তাই তুমি এক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছ সন্দেহ নেই। হোক যুদ্ধ, এই যুদ্ধে যদি স্বয়ং দেবরাজও তোমার সাহায্যার্থে যুদ্ধ করেন তাতেও তুমি অব্যাহতি পাবে না। তোমার যুদ্ধাভিলাষ আচিরেই নিবৃত্ত হবে। আমার শক্তি ও বিক্রমের ধারণা তোমার নেই।

অর্জুন বললেন—

রাধেয়! তুমি এইমাত্র রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে নিজের জীবন রক্ষা করেছিলে তোমার সহযোদ্ধারা নিহত হয়েছে তথাপি তোমার লজ্জা বা অনুশোচনা নেই। তোমার মতো নির্লজ কাপুরুষ দ্বিতীয়টি ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই কথা বলে অর্জুন কর্ণের দিকে বর্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করলে কর্ণও তৎক্ষণাৎ অর্জুনের প্রতি শরবর্ষণ করতে থাকেন। অর্জুন বাণদ্বারা কর্ণের তূণীর রজ্জু কর্তন করলে কর্ণ অন্য তূণীর থেকে শরবর্ষণ করতে থাকে। সহসা অসংখ্য কর্ণসৈন্য অর্জুনকে একযোগে আক্রমণ করলে অর্জুন সবাইকে শমনভবনে পাঠিয়ে আবার কর্ণকে আক্রমণ করেন। কর্ণের রথের অশ্ব ও সারথি নিহত হয়। অর্জুন কর্ণের দিকে এক জ্বলন্ত বাণ নিক্ষেপ করেন, সেই বাণের আঘাতে কর্ণ মূর্চ্ছিত হন, কিয়ৎকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে কর্ণ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রণস্থল ত্যাগ করেন।

এই মহাসংগ্রাম দর্শনে কুমার উত্তর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লে অর্জুন তাঁকে তার বংশগৌরব ও বীরত্বের কাহিনি শুনিয়ে উজ্জীবিত করেন। অতঃপর ভীষ্মকে আক্রমণ করে তাঁকে সংজ্ঞাহীন করেন এবং সম্মোহন বাণে কুরু সেনাপতিদের মূর্চ্ছিত করে উত্তরের সাহায্যে তাঁদের বস্ত্রগুলি অপহরণ করেন। যুদ্ধ জয়ের পর আবার সেই শমীবৃক্ষের কাছে গিয়ে অর্জুন অস্ত্রগুলি পুনরায় উত্তরকে দিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

এদিকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে কৌরবগণ লজ্জায় অপমানে ও ভয়ে দ্রুত বিরাটনগর ত্যাগ করলেন। অর্জুন উত্তরকে আপাতত যুদ্ধের সমুদয় ঘটনা প্রকাশ না করার নির্দেশ দিলেন। বিরাট নগরবাসী যেমনটি দেখেছে বৃহন্নলার সারথ্যে উত্তরের যুদ্ধযাত্রা, তেমনিই জানুক উত্তরই এই যুদ্ধজয় করেছে। উত্তর যেন কোনো অবস্থাতেই পঞ্চপাণ্ডবদের বিরাট নগরের প্রাসাদে অবস্থান করছেন একথা যেন প্রকাশ না পায়। গোগৃহে গোধনের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বিজয়ী উত্তর ও বৃহন্নলা নগরে প্রবেশ করলে নগরবাসী বিজয় উৎসবে মেতে উঠেন।

উৎসব বিরাট রাজপ্রসাদেও। উত্তরের বীরত্বে গর্বিত বিরাট। অপরাজেয় কুরুসেনাকে নবীন যোদ্ধা উত্তর পরাজিত করেছে এই কথা তিনি বারবার বয়স্য কঙ্ককে বলছেন। কঙ্কও বলছেন যেখানে সারথি বৃহন্নলা আছেন সেখানে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। বার বার বৃহন্নলার নাম উল্লেখ করাতে রাজা বিরাট ক্রুদ্ধ হয়ে কঙ্ককে হস্তস্থিত পাশা ছুঁড়ে মারেন। পাশার আঘাতে কঙ্কের কপাল কেটে যায়, রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ সৈরিন্ধ্রী এক স্বর্ণপাত্র ধরে রক্তধারা ভূমিতে পড়া আটকায়। কারণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে যুধিষ্ঠিরের রক্ত ভূমিতে পতিত হলে প্রহারককে তিনি হত্যা করবেন।

এমন সময়ে উত্তর ও বৃহন্নলা ফিরে এল। রাজা বিরাটের আজ আনন্দের দিন। সুশর্মাকে পরাজিত করে বল্লভ বিরাটকে উদ্ধার করেছে, আবার বৃহন্নলার সারথ্যে উত্তর কুরুদের বিতারিত করে ষাট হাজার গোধন উদ্ধার করেছে।

ক্রমে উত্তর সব বৃত্তান্ত পিতার কাছে ব্যক্ত করল এবং পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশ করলেন। এই বার্তা ছড়িয়ে পড়লে পাণ্ডবদের মিত্রগণ বিরাট রাজ্যে উপস্থিত হলেন। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ-বলরাম, সুভদ্রা অভিমন্যু, এলেন দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সঙ্গে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র। বিরাটের আগ্রহে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইবার কৌরবদের কাছ থেকে হৃতরাজ্য উদ্ধারের প্রস্তুতি।

* * * * *

একা পার্থের হাতে ভুবনবিখ্যাত কৌরববাহিনীর পরাজয়

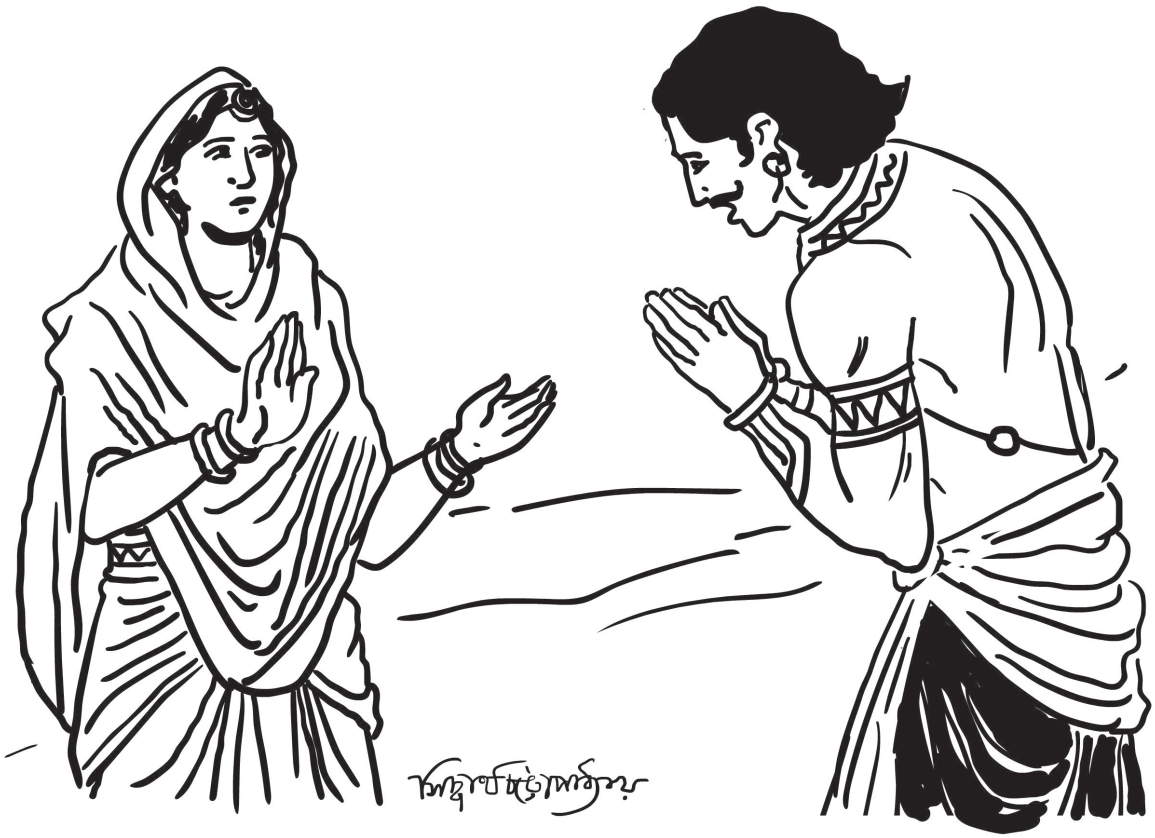

কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না মহামানী দুর্যোধন। অর্জুন শেষ পর্যন্ত তার শিরস্ত্রাণটাও কেটে দিল। এ যেন শার্দূলের হাতে কুঞ্জর প্রধানের পরাজয়। সভামধ্যে অধোমুখে বসে আছেন দুর্যোধন, রথী, মহারথী, পার্ষদবর্গ কারও মুখে কোনো কথা নেই। দুর্যোধনের পাশের আসনে বসেছিলেন সখা কর্ণ। তিনি প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—

—মহারাজ, চিন্তা ত্যাগ করুন। পঞ্চপাণ্ডবকে মারার জন্য কৌশল স্থির করতে হবে। যে কৌশলে ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধ করেছিলেন, অথবা স্বয়ং মহাদেব ত্রিপুরকে বধ করেছিলেন। পাণ্ডব বধের জন্য আমাদেরও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমার মতে অবিলম্বে বিরাটনগরে দূত পাঠিয়ে পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ করে হস্তিনায় আনা হোক। বিরোধ নিরসনে তাঁদের ভোজনে আপ্যায়িত করা হবে। সুপকারদের গোপন সংকেত দিতে হবে যেন তারা পাণ্ডবদের খাদ্য ও পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দেয়। বিষপানে হীনবল হলে কৌরব যোদ্ধারা তাঁদের বেষ্টন করে হত্যা করবে। ছলে-বলে শত্রু নিধন শাস্ত্রের বিহিত। অথবা সৈন্য সজ্জা করে বিরাট নগরী আক্রমণ করা হোক। বিরাটের পুরী চতুর্দিকে ঘিরে অগ্নি সংযোগ করে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারা হোক। কর্ণের এইসব পরিকল্পনা দুর্যোধনের মনঃপুত হলো না, কারণ অতীতে এইরকম বহু পরিকল্পনা পাণ্ডবরা ব্যর্থ করেছে।

দুর্যোধন এবার যুদ্ধপণ করলেন। বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র মেদিনীও ছাড়া হবে না। এবার পাণ্ডবদের ধনে প্রাণে শেষ করতে হবে। কর্ণকে বললেন—

—সখা! তুমি দিকে দিকে দূত প্রেরণ কর। আমার অধিকারে যত রাজা আছে সবাইকে বার্তা পাঠাও। মদ্ররাজ, সুমন্ত, কলিঙ্গ, কামোদ, ভোজ, বাহ্লীক, সুর্শমা সবাইকে যুদ্ধের জন্য বরণ কর। এই আসন্ন যুদ্ধের জন্য একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য সমাবেশ করতে হবে, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে।

দুর্যোধনের এই সিদ্ধান্তে কর্ণ অতিশয় প্রীত হলেন। বুদ্ধি, বলে ও গুণে দুর্যোধনকে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলে রাধেয় ঘোষণা করলেন। দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, প্রজাপতিদের মধ্যে দক্ষ, তারাগণের মধ্যে চন্দ্র তেমনি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে দুর্যোধন প্রধান বলে কর্ণ সগর্বে ঘোষণা করলেন। ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধ বিমুখ হলে শাস্ত্রমতে তাঁকে ক্ষত্রিয়রূপে গণ্য করা যায় না। কর্ণ ও দুর্যোধন সেই মুহূর্ত থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কর্ণ দুর্যোধনের এই যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে ভীষ্ম এইবার কথা বললেন—

—দুর্যোধন! কর্ণ! তোমাদের এই যুক্তি আমি মানতে

পারলাম না। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ উত্তম দেখায় না। এযাবৎ পাণ্ডবেরা তোমাদের অহিত কিছু করেনি। তাই এই সর্বনাশা যুদ্ধের পরিকল্পনা ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন কর তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ। তুমি স্বেচ্ছায় তাদের যে রাজ্যভাগ দেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে।

ভীষ্মের বাক্যে দুর্যোধন অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বললেন—

—প্রাণ গেলেও আমি শত্রুর ভজনা করব না। শত্রুর হাতে যে রাজ্য তুলে দেয় তাকে শত ধিক। সে ক্ষত্রিয়ের অযোগ্য।

ভীষ্ম বললেন—তবে তোমার যা ইচ্ছা কর। যুদ্ধানলে দগ্ধ হওয়াই তোমার ভবিতব্য। তবে তুমি একা দগ্ধ হবে না সমগ্র কুরুকুলকেও মজাবে।

অতঃপর দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টকেতু, বাহ্লীকরাজ প্রত্যেকেই ভীষ্মের কথা মেনে নেওয়ার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করলেন। পূর্বে যে ইন্দ্রপ্রস্থের উপর পাণ্ডবগণের অধিকার ছিল সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে বিবাদ মিটিয়ে নেবার জন্য একে একে সবাই পরামর্শ দিলেন দুর্যোধনকে। কিন্তু পাষণ্ড দুর্যোধন কারও কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। সকলেই তখন অদৃষ্টকে মেনে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। দুর্যোধন ও কর্ণ তখন ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পরিকল্পনায় ব্যস্ত হলেন।

* * * * *

এদিকে বিরাট রাজ প্রাসাদেও বসেছে আর এক মন্ত্রণা সভা। দায়মুক্ত পঞ্চ পাণ্ডব, অর্জুন পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাট রাজকন্য উত্তরার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রাতঃকালে সভায় উপস্থিত আছেন পঞ্চপাণ্ডব, রাজা বিরাট, উত্তর, রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সবার সম্মুখে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমেই দ্রুপদ পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস অন্তে আপন পৈতৃক রাজ্য কৌরবদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে প্রিয়ংবদ, স্থিতধী কোনো দূতকে হস্তিনায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠানোর জন্য সবার অনুমোদন প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। কোনো প্রিয়ংবদ, প্রাজ্ঞ দূত গিয়ে যদি জ্যেষ্ঠতাত, পিতামহ ও দুর্যোধনকে এবং সূতপুত্র কর্ণকে বুঝিয়ে যদি আপোশে নিষ্পত্তি করতে পারে তবে বিবাদে কাজ কী? আর যদি তাঁরা সম্প্রীতি না করে তখন অন্য বিধান নেওয়া হবে।

পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন বাস্তব কথাটাই বললেন—

—হস্তিনায় দূত প্রেরণ অনাবশ্যক, কারণ পাপাচারী দুর্যোধন সম্প্রীতে রাজ্য প্রত্যার্পণ করবে না। দুর্যোধন যতটা দুরাচার কপট তার থেকেও অধিক তার পরমসখা কর্ণ। বিনাযুদ্ধে তারা কদাপি শান্ত হবে না। আমার মতে আমাদের যৌথবাহিনী নিয়ে হস্তিনাপুর আক্রমণ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির বাহুবলে আপন হৃতরাজ্য উদ্ধার করুন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যে ভীম অত্যন্ত প্রীত হলেন। অর্জুনও সহমত পোষণ করে অচিরেই হস্তিনাপুর আক্রমণ করে কৌরবদের বিনাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নকুল,সহদেবও সহমত পোষণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ নীরবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এইবার প্রথম কথা বললেন। শ্রীকৃষ্ণের মতামত শোনার জন্য সভাস্থ সকলে এতক্ষণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

—যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, ফাল্গুনী, নকুল ও সহদেবের মত সমুচিত। তথাপি শাস্ত্রের বিধান, রিপুর সঙ্গেও সম্প্রীতির সন্ধান করা উচিত। আমার মত এই যে হস্তিনাপুরে একজন বাগ্মী, দূরদর্শী দূত প্রেরণ করা হোক। তিনি শাস্ত্রের বিধানে কৌরবদের ধর্মনীতি বোঝাবেন। তাতে যদি দুর্যোধন রাজ্যপাট ফিরিয়ে দেয় ভাল অন্যথায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সভাস্ত সকলে একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ধৌম্যকে দূত রূপে হস্তিনায় প্রেরণ করা হলো। শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকা ছেড়ে এসেছেন বহুদিন হয়ে গেল। তিনিও এবার সপার্ষদ দ্বারকায় ফেরার অনুমতি চাইলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের হাত ধরে বললেন—

—হে নারায়ণ! দুষ্ট দুর্যোধন, সম্প্রীতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এই যুদ্ধে কৌরব সহায় মহা মহা বীরগণ। আর আমাদের সহায় কেবলমাত্র তুমি। তুমি অনুকূল না হলে আমরা পঞ্চভ্রাতা কালসলিলে নিমজ্জিত হব।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

—আমি সর্বদা পাণ্ডবদের সঙ্গে আছি। আসন্ন মহারণে আমি পার্থের রথের সারথি হব। পার্থের বিক্রম ত্রিভুবনে খ্যাত, পার্থ একাই কুরুদের পরাজিত করতে পারে। এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সবান্ধব দ্বারকাবতীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

এদিকে কুরুসভায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আসীন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্যোধন, কর্ণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব আসনে আসীন। অন্যান্য অমাত্যগণও সভায় উপস্থিত। এমন সময় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সভায় প্রবেশ করলেন পাণ্ডবদের প্রেরিত দূত পণ্ডিত ধৌম্য। ব্রাহ্মণ দেখে সভাসদরা তাঁকে সসম্মানে বরণ করে মহার্ঘ আসনে বসালেন।

এইবার ধৌম্য আপন পরিচয় দিয়ে তাঁর আগমনের কারণ কুরুসভায় ব্যক্ত করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য, খুল্লতাত বিদুরের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করে, ভ্রাতাদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে তাঁদের পৈতৃক রাজ্য প্রত্যার্পণের জন্য প্রার্থনা

জানিয়েছেন।

ধৌম্যের এই বচন শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—হে পণ্ডিতপ্রবর! আপনার বাক্য অসদৃশ হয়। পাণ্ডুর তনয়রা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। আমার পুত্র দুর্যোধন এবং কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের নিমিত্ত এইসব অঘটন ও পাণ্ডুপুত্রদের এই দুর্ভোগ। তাঁরা যথাযথভাবে তাঁদের শর্ত পালন করেছে। অতএব এখন তাঁদের সমুচিত ভাগ ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁদের প্রাপ্য ধনরত্ন-সহ ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

ধৃতরাষ্ট্রের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে ভীষ্ম অত্যন্ত প্রীত হলেন। ভীষ্ম অবগত আছেন যদি পাণ্ডবদের অপহৃত রাজ্যপাট ও ধনরত্ন তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে যে মহাসংগ্রাম হবে তাতে কুরুকুল বিনাশ হবে। তাই পাণ্ডবদের আহ্বান করে সসম্মানে তাঁদের প্রাপ্য অংশ প্রত্যার্পণ করে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা আশু কর্তব্য।

সভামধ্যে দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, বাহ্লীক নৃপতি প্রত্যেকেই পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে আপোশ মীমাংসার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু দুর্যোধন এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানবেন না। ধৃতরাষ্ট্র তখন দুর্যোধনকে অতীতের বিভিন্ন উপমা দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। ভাই ভাই বিরোধে মহা সর্বনাশ সমুপস্থিত হবে। তাই পাণ্ডবদের হস্তিনায় আহ্বান করে তাঁদের প্রাপ্য ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

পিতা ও সভাস্থ সকলের মতামত শোনার পর দুর্যোধন বললেন—আপনাদের এই বিচার ন্যায়সঙ্গত নয়। পাণ্ডবরা আমার পরম শত্রু, তাদের সঙ্গে কখনও সম্প্রীতি সম্ভব নয়। বিনাযুদ্ধে শত্রুকে রাজ্য,ধন ফিরিয়ে দেওয়া ক্ষাত্রধর্ম শাস্ত্রসম্মত নয়। ওই পরম শত্রুকে আমি বিশ্বাস করি না এবং এই রাজসভায় কেউ সেই শত্রুর মহিমা প্রকাশ করে তাও আমার অভিপ্রেত নয়। পিতা আপনি রুষ্ট হোন, ক্রুদ্ধ হোন, বিনা যুদ্ধে আমি পাণ্ডবকে রাজ্যভূমি ছাড়ব না।

এই কথা বলে দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন সহ দুষ্ট মন্ত্রীদের নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। বিফল মনোরথ হয়ে ধৌম্য ফিরে গেলেন বিরাটরাজ্যে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীকরাও অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করলেন।

* * * * *

বিরাট রাজসভায় আলোচনা হচ্ছিল হস্তিনায় কী হতে পারে। দুর্যোধন যে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না তা নিয়ে সবাই একমত। এমন সময় প্রবেশ করলেন পণ্ডিতপ্রবর ধৌম্য। জানালেন কুরু রাজসভার বৃত্তান্ত। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুরাদির সৌজন্য, দুর্যোধনের ক্রূরতা, ঔদ্ধত্য। এবার বিরাট সভায় সকলে একমত যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এবার সৈন্য সংগ্রহের তৎপরতা শুরু করতে হবে। সর্বাগ্রে এই সংবাদ জ্ঞাত করাতে হবে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে। জানতে হবে তাঁর অভিমত। দ্রুপদ, বিরাট, পাণ্ডবদের পরম আত্মীয় এছাড়া অন্যান্য রাজাদেরও আমন্ত্রণ জানাতে হবে যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বনের জন্য।

দুর্যোধন কালবিলম্ব না করে ইতিমধ্যেই সৈন্য সমাবেশ শুরু করে দিয়েছেন। চেদিরা দুর্যোধনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমন্ত্রণ পেয়ে ভগদত্তও সসৈন্যে এসে হাজির। রাজা বৃহদ্বলও পত্রপাঠ সসৈন্যে এসে গেছেন। কলিঙ্গ নরপতিও রণসাজে সজ্জিত হলেন দুর্যোধনের আমন্ত্রণ পেয়ে। কিরাত, যবনরাও এসে উপস্থিত দুর্যোধনের শিবিরে। এসেছেন মীনধ্বজ অর্বুত অর্বুদসেনা নিয়ে। এলেন দুর্যোধনের পরম মিত্র রাজা সুশর্মা বিশাল বাহিনী নিয়ে। অগণিত সৈন্য নিয়ে আসে ত্রিগর্ত রাজা। এলেন রাজা ক্ষেমবতী, রাজা অনুবিন্দ, রাজা সুমন্ত্র আর রাজা জরাসন্ধও প্রচুর সৈন্য নিয়ে উপস্থিত। এইভাবে প্রায় ছয় হাজার নৃপতি, রথ, অশ্ব, গজরথী, পদাতিক সমবেত হলো দুর্যোধনের শিবিরে। এই বিপুল সংখ্যক সেনা এবং গজ, অশ্ব রাখার জন্য দুর্যোধনের নির্দেশে কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আগমন স্কন্ধবার নির্মিত হলো। হাতি এবং অশ্বের রাখার জন্য নির্মিত হলো হাতিশালা ও অশ্বশালা। মজুদ হলো অফুরন্ত রসদ।

এদিকে পাণ্ডবরাও আর চুপ করে বসে নেই। পাণ্ডবদের যত মিত্র, সুহৃদ, বন্ধুজন আছে সবাইকে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। সৌবল, সুমিত্র, মদ্র, যদু, ভোজ অন্ধ্র, পাণ্ডবগণের বার্তা পেয়ে সবাই সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। দ্রুপদ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তত্ত্বাবধানে কুরুক্ষেত্রে তৈরি হলো পাণ্ডব শিবির পরিখা, জলাশয়, হাতিশালা, অশ্বশালা খাদ্যভাণ্ডার সবই নির্মিত হলো সুপরিকল্পিতভাবে।

এইভাবে যখন দিকে দিকে রাজন্যবর্গকে স্বপক্ষে আনার জন্য সচেষ্ট তখন দুর্যোধন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর উলূককে দূতরূপে পাঠালেন। এই সংবাদ অপগত হয়ে পিতামহ ভীষ্ম বললেন—

—দ্বারকাধিপতির কাছে তুমি না বুঝে দূত প্রেরণ করেছ। ত্রিভুবন জানে কৃষ্ণ পাণ্ডব হিতৈষী, তোমার স্বপক্ষে কৃষ্ণ কদাচিত আসবেন না।

কর্ণ বললেন—

—মিত্র! কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মিত্র। তোমার কোন কাজে, কবে কৃষ্ণ সহায় হয়েছেন? তাঁর কাছে দূত পাঠানোটাই তোমার উচিত হয়নি। যদি-বা কৃষ্ণ তোমার সপক্ষে আসে কপটতার আশ্রয় নিয়ে তোমার সর্বনাশ করবে। তুমি বরং বলরামের কাছে দূত পাঠাও। সংকর্ষণ তোমার সহায় হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

শকুনি ও দুঃশাসন কর্ণের প্রস্তাব একবাক্যে সমথন করলেন। শকুনি বললেন—দুর্যোধন! একটা কথা বলি শোন, কৃষ্ণকে পেয়ে তোমার কোনো কাজ হবে না। শত কৃষ্ণের সমান কর্ণ আমাদের সহায়। তবে কৃষ্ণের যে নারায়ণী সেনা আছে তারা সমরে অজেয়, দেবতার সমান তাদের তেজ সেই নারায়ণী সেনা যদি কৃষ্ণের কাছে চেয়ে নিতে পার তবে এই যুদ্ধে জয় তোমার অনিবার্য।

দুর্যোধন বললেন—আমি যুদ্ধহেতু কৃষ্ণকে বরণ করতে চাইছিনা। আমি চাই কৃষ্ণ আমার রথের সারথি হোক।

দুর্যোধনের এই বাক্য শুনে দ্রোণ ও কৃপ বললেন—

—এরকম বাক্য তুমি মুখে আনছ কী করে? শ্রীকৃষ্ণ হবেন তোমার সারথি। যিনি সর্বদা পাণ্ডব সহায়, তিনি তোমার সারথি হবেন তা তুমি ভাবলে কী করে?

এই বিতণ্ডার মধ্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—দুর্যোধন! পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করার আগে তুমি বরণ করে নাও।

দুর্যোধন ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত পাঠিয়েছিল। সেই দূত উলুক কী বার্তা নিয়ে আসে তার জন্য অপেক্ষা করা কর্তব্য। যথা সময়ে উলুক হস্তিনায় ফিরে এল শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন অর্জুন তাঁকে বরণ করতে আসছেন, দুর্যোধনও যদি আসেন তবে সে তাঁকে আগে বরণ করবেন। অর্জুন দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন দূতমুখে সংবাদ পেয়ে দুর্যোধনও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন। পাঁচদিন পরে অপরাহ্নে অর্জুন ও দুর্যোধন দ্বারকায় পৌঁছালেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে শুনলেন কৃষ্ণ তখন নিদ্রামগ্ন। তাঁরা সেই শয়নমন্দিরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রামগ্ন। পালঙ্কের শিয়রের দিকে এক রত্ন সিংহাসন। দুর্যোধন সেই সিংহাসনে উপবেশন করলেন। নিদ্রামগ্ন কৃষ্ণের পায়ের কাছে এক অতি সাধারণ আসন। অর্জুন সেই আসনে উপবেশন করে নির্নিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর চরণপদ্মে ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করছেন। কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করে অর্জুনের এই হীন আচরণ, দুর্যোধন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না।

নিদ্রাভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দেখলেন অর্জুনকে। তাঁকে আলিঙ্গন করে কুশল বিনিময় করলেন। এবার ধনঞ্জয় আগমনের কারণ জানালেন কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ অনবার্য উভয়পক্ষই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় অগ্রজ যুধিষ্ঠির আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমাকে আমাদের পক্ষে বরণ করতে।

অগ্রজের আবেদন তুমি আমাদের পক্ষে সারথ্য গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন— অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করব।

শুনে অর্জুন অত্যন্ত হৃষ্টমন হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম জানালেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন দুর্যোধনের দিকে। দুর্যোধনকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ যথাযথ সম্মান দেখিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুর্যোধন বললেন—

—আমি বহুক্ষণ এখানে এসেছি, অর্জুন আমার পরে এসেছে। যাহোক তোমার সারথ্যগুণ ভুবনবিদিত। তাই আমি এই প্রার্থনা নিয়ে এসেছি যে আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সারথি হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

—কুরুরাজ! তুমি যথার্থই বলেছ। কিন্তু আমাকে ইতিপূর্বে অর্জুন সারথিপদে বরণ করেছে, তাই তোমার প্রার্থনা পূরণে আমি অপারগ। তবে তোমাকে আমি শূন্যহাতে ফিরাব না। আমার নারায়ণী সেনা ভুবনবিখ্যাত। বলে বীর্যে তারা আমার সমকক্ষ। যদি তুমি সম্মত থাক তবে এই অপরাজেয় সেনা তুমি গ্রহণ করতে পার। অগ্রজ বলরাম তীর্থক্ষেত্র থেকে আমাকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন আসন্ন কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে আমাকে অস্ত্রধারণ না করতে, কাজেই এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব না।

নিরস্ত্র কৃষ্ণের থেকে সশস্ত্র অপরাজেয় নারায়ণী সেনা দুর্যোধনের কাছে অধিক কাম্য, তিনি কৃষ্ণের কাছে নারায়ণী সেনা প্রার্থনা করলেন এবং এই বিশাল সেনা নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

নারায়ণী সেনা দুর্যোধনকে দেওয়াতে অর্জুনের মনে দুঃখ হলো। এই অপরাজেয় নারায়ণী সেনা দুর্যোধনের হাতে, তার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। কৃষ্ণ বললেন—নারায়ণী সেনার মৃত্যু তোমার হাতে। মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে এক যুদ্ধে এই নারায়ণী সেনা আমি সৃষ্টি করেছিলাম। তোমার হাতে তাদের মৃত্যুও আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ এলেন পাণ্ডব শিবিরে। যুদ্ধ পাণ্ডবদের কাম্য নয়। যুদ্ধে রক্তক্ষয়, আত্মীয় বিয়োগ, রাজ্যের অর্থনীতি পঙ্গু। শ্রীকৃষ্ণেরও একই মত। সম্প্রীতি, আপোশে নিষ্পত্তি, কিন্তু কৌরবরা বিশেষত দুর্যোধন ও তার দুষ্ট মন্ত্রীরা যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ শেষ চেষ্টায় আগ্রহী। যদি কোনোভাবে এই আসন্ন যুদ্ধ রদ করা যায়?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ধর্মরাজ! আমি আপনাদের উভয় পক্ষের হিতার্থে কৌরবসভায় গমন করব। যদি শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে পাণ্ডব, কৌরব এবং যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ রক্তপাত ও মৃত্যুপাশ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে এবং আমারও তাতে মহাফলপ্রদ পুণ্য লাভ হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে কৃষ্ণ! আমার মতে তোমার কৌরব সভায় গমন যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ সেস্থানে তুমি যতই হিতকর বাক্য প্রয়োগ কর দুর্যোধন তা মানবে না। অন্যান্য যেসকল নৃপতি ওখানে আছেন তাঁরাও দুর্যোধনের আজ্ঞাবহ।

অতএব তোমার কৌরবসভায় গমন যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তোমার অপমানের বিনিময়ে দেবত্বও আমাদের অভিপ্রেত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ধর্মরাজ। পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের প্রকৃতি আমার আজানা নয়। কিন্তু অগ্রে সেখানে উপস্থিত হয়ে সন্ধিপ্রস্তাব উত্থাপন করলে লোকমধ্যে আমরা নিন্দনীয় হব না। সুতরাং আমি কুরুসভায় গমন করছি।

যথাসময়ে কৃষ্ণের রথ এসে থামল কৌরব সভাগৃহের সিংহদ্বারে। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করলেন। বিদুর ও সাত্যকির হস্ত ধারণ করে তিনি রাজসভায় প্রবেশ করলেন তাঁর সম্মুখে কর্ণ ও দুর্যোধন এবং পশ্চাতে কৃতবর্ম্মা, শকুনি, দুঃশাসন প্রমুখ রাজপুরুষ। নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন শ্রীকৃষ্ণ। কুশলাদি বিনিময়ের পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে কুরুসভার কাছে সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

—হে ভরত বংশাবতংস! আমার মানস এই যে কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়। বীরপুরুষদের বিনাশ না হয়। এই প্রার্থনা নিয়ে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আপনাকে অন্য কোনো হিতোপদেশ দেওয়ার বাসনা নেই। এক্ষণে কুরুকুলে ঘোরতর বিপদ আগত। আপনি যদি এই পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করেন, এর ফলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হবে। আপনি শান্তি স্থাপন করলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হবে। অতএব বৈরিতা নিষ্ফল বিবেচনা করে শান্তি স্থাপনে যত্নবান হোন।

ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সাগ্রহে শ্রবণ করলেন। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকার পর বললেন—হে কেশব ! তোমার বাক্য সুখকর, লোকাচারসঙ্গত, ধর্মানুগত, ন্যায়পরায়ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি স্বাধীন নই। সুতরাং আমার কোনো প্রিয়কার্য অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব তুমি পাপাত্মা দুর্যোধনকে শান্ত করার চেষ্টা কর। সে গান্ধারী, ধীমান বিদুর বা ভীষ্ম প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণের হিতকর বাক্য শ্রবণ করে না। তুমি স্বয়ং সেই ক্রূরাত্মাকে শাসন কর, তা হলে তোমার বন্ধুজনোচিত্ত কার্য করা হবে।

শ্রীকৃষ্ণ তখন দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

—হে ভ্রাতঃ! পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা, তোমার পিতার ও অন্যান্য অমাত্যগণের নিতান্ত অভিপ্রেত। এক্ষণে তা তোমারও অনুমোদিত হোক। যে ব্যক্তি সুহৃদবাক্য শ্রবণ করে, গ্রাহ্য করে না, সেই ব্যক্তিকে পরিশেষে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করতে হয়। অতএব তুমি ধর্মপথে এসে পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্যপাট তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে সম্প্রীতির কবলে আবদ্ধ হও, এতে দুই পক্ষেরই কুশল।

কৌরবসভায় উপস্থিত প্রাজ্ঞজন, মুনিঋষিগণ সবাই পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধে করলেন। ক্রান্তদর্শী ঋষি মুনিগণ এও জানালেন যে যদি যুদ্ধ হয় তাতে কুরু বংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্যোধন অনড়, তাঁর কথায়।

—আমার জীবদ্দশায় পাণ্ডবের সঙ্গে সন্ধি হবে না। যুদ্ধ ছাড়া পাণ্ডবদের আমি রাজ্য দেব না। এই আমার পণ। পাণ্ডবরা যুদ্ধ করুক, আমাদের পরাজিত করে, সমগ্র কুরু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হোক।

শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসি মুখে বললেন—দুর্যোধন! তোমার মনের কথা বুঝতে পারলাম। তোমার বীরত্বের প্রতিশ্রদ্ধা জানিয়ে আমি একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা তোমার কাছে নিবেদন করছি। তোমাকে পাণ্ডবগণের অর্ধরাজ্য ছাড়তে হবে না, তাঁরা তোমার অধীন হয়ে পাঁচটি গ্রাম ছেড়ে দাও। তুমি সুখে রাজ্য ভোগ কর, শুধুমাত্র পাণ্ডব-নগর, কুশস্থল, সিদ্ধিগ্রাম, ইন্দ্রপ্রস্থ আর বারণাবত গ্রাম পাঁচটি তাঁদের ছেড়ে দাও। বিবাদের অবসান হোক।

কৃষ্ণের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—অতি উত্তম, দুর্যোধন তুমি কৃষ্ণের এই প্রস্তাব মেনে নাও, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাক্।

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে দুর্যোধন ক্রোধভরে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করলেন—

—বিনাযুদ্ধে আমি সূচ্যগ্র মেদিনীও পাণ্ডবদের দেব না। সূর্যদেব পশ্চিমে উদিত হলে, আকাশ ভূমিতে লুটিয়ে দিনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোভিত হয় তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা খণ্ডন হবে না।

বিফল মনোরথ হয়ে কৃষ্ণ ফিরে আসছেন পাণ্ডব শিবিরে। দুর্যোধন এরমধ্যে আর এক ষড়যন্ত্র করেছেন কৃষ্ণকে বন্দি করার জন্য। সভামধ্যে ছদ্মবেশে বহু বীর যোদ্ধা নিয়োজিত আছে। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের কাছে কিছুই অবিদিত থাকে না। প্রচণ্ড অট্টহাস্যে সভাস্থল প্রকম্পিত করে শ্রীকৃষ্ণ বিশাল দেহ ধারণ করলেন। আকাশব্যাপী প্রলম্বিত এই দেহে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি সকল দেবতা, নবগ্রহ, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সর্পকুল স্থাবর-জঙ্গম সবই বিরাজিত। এই বিশ্বরূপ দেখে তপস্বীরা স্তব করতে লাগলেন, পাপীরা মূর্চ্ছিত হলো। সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের সময় কৃষ্ণ দেখলেন পথের পাশে কর্ণ একাকী দাঁড়িয়ে আছেন, হয়তো শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভের আশায়। দাঁড়ালেন কৃষ্ণ, বললেন— বসুসেন আমাকে খানিকপথ এগিয়ে দাও।

কর্ণ নিজের রথে না উঠে, উঠলেন শ্রীকৃষ্ণের রথে। রথ চলতে লাগল, সেদিন শ্রীকৃষ্ণের মুখে কর্ণ জানলেন তাঁর আসল পরিচয়। কৃষ্ণ বললেন—বসুসেন! তুমি আজ আমার সঙ্গে চল। পাণ্ডবরা জানুক তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। জননী কুন্তী ও মিত্রগণ আনন্দিত হবেন। পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ হোক। যুধিষ্ঠির তোমাকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে শ্বেতচামর ব্যজন করবেন। ভীম ধরবেন রাজচ্ছত্র। অর্জুন হবেন তোমার রথের

সারথি। পঞ্চপাণ্ডব হবেন তোমার অজ্ঞাবাহ সেবক এবং দ্রৌপদী করবেন তোমার চরণ বন্দনা। ভারতের সমস্ত রাজা, রাজকুমার, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধাগণ তোমারই চরণে মস্তক নত করবেন। পুরোহিত ধৌম্য করবেন তোমার রাজ্যাভিষেক। সূত, মাগধ বন্দিগণ করবে স্তুতি ও যশোগান। চতুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ তোমার মস্তকে শান্তিবারি সিঞ্চন করবেন। তুমি নক্ষত্র পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজ্য শাসন এবং কুন্তীর আনন্দবর্ধন কর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে কর্ণ বিষণ্ণ বদনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— হে নারায়ণ! তুমি যা বললে আমি তা জানি। আমি সূর্যের পুত্র হয়েও জননীর দ্বারা পরিত্যক্ত। আর আমি এও জানি তুমি যা বলছ আমার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণ, আমি কেমন করে ভুলব, অধিরথ সূত আমাকে পরম স্নেহে লালন করেছেন। তাঁর পত্নী রাধার স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছে আমারই জন্য। তিনি অপত্যস্নেহানুসারে শাস্ত্রানুগত বিধিদ্বারা আমার জাতকর্মাদি সম্পন্ন করে আমার নাম বসুসেন রেখেছেন। আমার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে, পরিবার রয়েছে। আমার হৃদয় সেখানে আবদ্ধ। অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশিকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে, হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করার সামর্থ্য আমার নেই। আমার আজকের প্রতিপত্তি, রাজকীয় সম্মান সব কিছুর মূলে দুর্যোধন। আবার রাজা দুর্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হয়েই উৎসাহ সহকারে পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছেন। দ্বৈরথযুদ্ধে আমিই সব্যসাচীর প্রতিযোদ্ধা বলে পরিগণিত হয়েছি। এক্ষণে আমি বধ, বন্ধন, ভয় বা লোভবশত ধীমান দুর্যোধনের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করতে পারব না।

তুমি যে আমার হিতের জন্য এত কথা বলছ তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই এবং পাণ্ডবগণ যখন তোমার বশীভূত হয়ে আছে তখন তারা অবশ্যই সমুদয় কার্য সম্পন্ন করবে। তুমি যে আমার জন্ম বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে গোপন করে রেখেছ তা আমি হিতকর বলে অঙ্গীকার করছি। জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে অগ্রজ বলে জ্ঞাত হলে আর রাজ্যপাট গ্রহণ করবেন না, আর আমি যদি এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই তা আমি দুর্যোধনকেই দান করব, অতএব ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজ্যেশ্বর হয়ে থাকুন।

হে কৃষ্ণ! আমি দুর্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অনেক কটুবাক্য বলেছি, এক্ষণে সেই অপকর্মের জন্য অনুতাপ হচ্ছে। আসন্ন যুদ্ধযজ্ঞের ফল আমি নক্ষত্রালোকে পাঠ করছি। যখন তুমি আমাকে ধনঞ্জয়ের হাতে নিহত হতে দেখবে, তখন এই যজ্ঞের অগ্নিচয়ন হবে। যখন ভীমসেন সিংহনাদ সহকারে দুঃশাসনের রুধির পান করবে তখন সোমরস পান সমাপন হবে। যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করবেন সেই সময়ে এই যজ্ঞের বিশ্রাম হবে। যখন মহাবল ভীমসেন দুর্যোধনকে সংহার করবে তখন তাঁর যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হবে। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ ও পৌত্রপত্নীরা স্বামীহীন, পুত্রহীন ও নাথহীন হয়ে গান্ধারী-সহ শিয়াল, শকুন ও কুকুরসঙ্কুল রণক্ষেত্রে রোদন করবেন তখন এই যজ্ঞের 'অবভৃথস্নান' সমাধান হবে। হে কেশব! ত্রিলোকের মধ্যে এই কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যতম স্থান, যাতে ক্ষত্রিয়গণ এই ক্ষেত্রে শস্ত্রদ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হয়ে স্বর্গলাভ করেন তা সম্পাদন কর, তাহলে এই পর্বত ও নদীসকল যাবৎ বর্তমান থাকবে তাবৎ তোমার কীর্তিও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষত্রিয়সমাজ এই যশস্কর মহাভারত যুদ্ধ কীর্তন করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে কর্ণ! আমি তোমাকে পৃথিবী প্রদান করলাম, কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করে শাসন করতে অনিচ্ছুক হলে, অতএব তুমি রাজ্যলাভের উপায় প্রাপ্ত হবে না। পাণ্ডবরাই জয়লাভ করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কর্ণ বললেন—হে মধুসূদন! তুমি আমাকে সম্যক জেনেও রাজ্য ও ধনসম্পদে আসক্ত করার চেষ্টা করছ। এই যে পৃথিবীর প্রলয়দশা সমুপস্থিত হয়েছে, আমি, শকুনি, দুঃশাসন ও রাজা দুর্যোধন— এই চার জন এর কারণ। পাণ্ডব ও কৌরবগণের এই ঘোরতর সংগ্রামে পৃথিবী রক্তে কর্দমাক্ত হবে। অনেক অনেক দুঃস্বপ্ন, ভয়ঙ্কর উৎপাত যুধিষ্ঠিরের জয় ও দুর্যোধনের পরাজয় সূচিত করছে। গ্রহ-নক্ষত্রের বিপরীত অবস্থানে কৌরবদের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত তাতে সন্দেহ নেই। হে কৃষ্ণ, ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রে কী হবে সবই তুমি জান। বৃথা কেন আমাকে ভোলাতে চাইছ? হে নারায়ণ! আর কি আমাদের দেখা হবে, নাকি স্বর্গেই আমাদের মিলন হবে? আমাকে এবার বিদায় দাও। তুমি যাও ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, সদাচারী পাণ্ডবদের শিবিরে আর আমি চললাম রসাতলগামী পাপাত্মা দুর্যোধন আর অনাচারী কৌরবদের শিবিরে।

শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে রথ থেকে অবতরণ করলেন কর্ণ। দুজনের চোখ অশ্রুসিক্ত। এগিয়ে চলেছে কর্ণের রথ কৌরব শিবিরের উদ্দেশে। শ্রীকৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন তাঁর গমনপথের দিকে।

* * * * *

জন্মের পর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার পর থেকে কর্ণের সব সংবাদ রাখতেন মাতা কুন্তী। সেই সংবাদে কখনও হর্ষে উৎফুল্ল হয়েছেন, কখনও-বা বিষাদে ভেসেছেন। আসন্ন যুদ্ধে কুন্তীর চিন্তা গেছে বেড়ে, কর্ণ যে পাণ্ডবদের বিপক্ষে! অর্জুনের সমকক্ষ অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী। এইবার কর্ণের আসল পরিচয় দিয়ে তাকে পাণ্ডবদের পক্ষে ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে। কর্ণের সঙ্গে একবার নিভৃতে সাক্ষাতের প্রয়োজন। কুন্তী সংবাদ

পেয়েছেন কর্ণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে যমুনায় স্নান করে দীর্ঘ সময় জপতপ করেন। পরদিন প্রাতে কুন্তী একাকী এলেন যমুনাতীরে। কর্ণ তখন উদীয়মান সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে স্তব করছেন। ধীর পদক্ষেপে কুন্তী এসে দাঁড়ালেন কর্ণের পশ্চাতে। স্তব শেষে কর্ণ পশ্চাদ্ দিকে দৃষ্টিপাত করতেই নয়নগোচর হলো এক দেবীমূর্তি। চম্‌কে উঠলেন কর্ণ, অনেকদিন স্বপ্নে এই দেবীমূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তবে অস্পষ্ট। কর্ণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—হে দেবি! সূত অধিরথের ঔরসজাত, রাধা গর্ভসম্ভূত কর্ণ আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে। ভদ্রে! আপনার এই স্থানে আগমনের হেতু কী ? আজ্ঞা করুন কী করতে হবে?

কুন্তী বললেন—বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন। রাধাগর্ভসম্ভূত নও। আর সূত অধিরথও তোমার পিতা নন। তোমার পিতা ভুবন প্রকাশ ভগবান দিনকর। তুমি আমার কানীন পুত্র। তুমি সহজাত কবচ কুণ্ডলধারী, দেবপুত্র সদৃশ ও দুর্ধর্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ।

কর্ণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—দেবী! আপনি অর্জুন জননী! কেন এসেছেন আজ আমার কাছে?

—তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

—কোথায়?

—তোমার আপন সহোদর ভ্রাতাদের কাছে।

—কেন হঠাৎ এতদিন পর মনে পড়লো সেই হতভাগ্য সন্তানের কথা, যাকে জন্মলগ্নে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করেছিলে।

—ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সহ্য করতে পারছি না বলে। ফিরে চলো আপন সহোদর ভাইদের কাছে। আপন জননীর কাছে।

—জন্মক্ষণে যে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছ, সেই স্বপ্ন আর দেখিওনা জননী। সহায় সম্বলহীন এক সূতপুত্রকে দুর্যোধন সম্পদ দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, রাজার মর্যাদা দিয়েছে। আজ এই আসন্ন সংগ্রামের মুহূর্তে তাঁকে পরিত্যাগ করার মতো দুর্বুদ্ধি যেন আমার না হয়। জননী ফিরে যাও পঞ্চপুত্রের কাছে। কথা দিলাম একমাত্র সব্যসাচী ছাড়া তোমার অন্যপুত্রদের আমি বধ করব না। এই যুদ্ধে হয় পার্থ নয় কর্ণের বিনাশ হবে, বাকি পাঁচপুত্র তোমার থাকবে। দূর থেকে জননীকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন কর্ণ। দুঃখ, গ্লানি, হতাশায় বিষাদ প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কুন্তী।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন শেষ। এই ভয়াবহ যুদ্ধে পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা আহোম এবং দক্ষিণে পাণ্ড্যদেশ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের নৃপতিগণ কোনও না কোনও পক্ষে যোগদান করলেন। কৌরবপক্ষে এগারো এবং পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে অবতীর্ণ হলো। এক অক্ষৌহিনী সেনা দলে ২১,৮৭০ রথ, ২১,৮৭০ হস্তী, ৬৫,৬১০ অশ্ব এবং ১,০৯,৩৫০ পদাতিক অর্থাৎ মাহুত ও সারথি-সহ প্রায় ২,৬২,৪৪০ জন লোক থাকত। সুতরাং ১৮ অক্ষৌহিণীতে ৪৭,২৩,৯২০ জন লোক থাকবার কথা। একটি মাত্র রণক্ষেত্রে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ, হস্তী ও অশ্বের সমাবেশ এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

কৌরবপক্ষের আগ্রহে এবং দুর্যোধনের অনুরোধে ভীষ্ম কুরুদের সেনাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন। তাঁর অঙ্গীকার, প্রত্যহ পাণ্ডব পক্ষের এক অযুত সৈন্য সংহার। তবে তিনি একটি নিয়মও নির্ধারণ করলেন। ভীষ্ম বললেন—

—সূতপুত্র কর্ণ সতত আমার সঙ্গে রণের স্পর্ধা করে এক্ষণে আমাদের উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে?

কর্ণ বললেন—মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি কদাচ অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব না। তিনি বিনষ্ট হলে পরে অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রাম করব।

ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণ ছিলেন সংগ্রামে অজেয়। তার ছিল সূর্য প্রদত্ত কবচ-কুণ্ডল। যতদিন কর্ণ ওই দৈব কবচ কুণ্ডলে ভূষিত থাকবেন ততদিন যুদ্ধে অবধ্য। তাই এবার এলেন পুত্র স্নেহাতুর পিতা ইন্দ্র। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। ভিক্ষার ছলে কর্ণের জীবনের শেষ রক্ষাকবচটি হরণ করতে। কর্ণ তা অবগত। আগের রাতে সূর্যদেব তাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন,

—তুমি যদি তোমার সহজাত কবচকুণ্ডল ইন্দ্রকে দান কর তাহলে জানবে তোমার আয়ু শেষ হয়েছে। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

কর্ণ বললেন—দেব আপনি আমাকে নিবারণ করবেন না। আমাকে ব্রতভঙ্গ করতে বলবেন না— 'ন নিবার্য্যে ব্রতাদস্মাৎ'। কর্ণ দাতা। বিশেষত কোনো ব্রাহ্মণ প্রার্থী হয়ে কর্ণ নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। কর্ণের সেই দানব্রত ত্রিলোক বিশ্রুত।

ছদ্মবেশী ইন্দ্র কর্ণের কাছে তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করলেন। স্মিত হেসে কর্ণ সেই ব্রাহ্মণকে বললেন—

—হে দেবরাজ! আমি আগেই জানতাম আপনি আমার কাছে এসে এই ভিক্ষাই চাইবেন। কিন্তু আপনাকে আমি নিরাশ করব না।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের হাতে কর্ণ তাঁর অঙ্গ থেকে কবচ কুণ্ডল ছিন্ন করে অম্লানবদনে ইন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। তখন অন্তরিক্ষে দেবতা, গন্ধর্ব, দানব সিংহনাদ করতে লাগল। স্বর্গে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল। দেবতারা কর্ণের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে সেনাপতিত্বে বরণ করা হলো দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিন, যোদ্ধারা সব রথে আসীন। ধনঞ্জয়ের রথের সারথি স্বয়ং

কৃষ্ণ। রথ নিয়ে যাওয়া হলো উভয়পক্ষের সামনে। বিপক্ষের যোদ্ধাদের দেখে মহারথী অর্জুন বিমর্ষ হয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন। কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? বিপক্ষে গুরু, পিতামহ, মাতুল আর ভাইয়েরা। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের বাণী শুনিয়ে উজ্জীবিত করলেন অর্জুনকে। শুরু হলো প্রচণ্ড সংগ্রাম।

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে কর্ণ অস্ত্রধারণ করেননি। যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মের পতন হলো। কিন্তু দক্ষিণায়নে ভীষ্ম দেহত্যাগ করবেন না। সেই শরশয্যায় উত্তরায়ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। শরশয্যার স্থানটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। মাংসাশী হিংস্র পশুরা যাতে আক্রমণ করতে না পারে তারজন্য রক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে প্রজ্বলিত হয়েছে মশাল। অর্জুনের তীক্ষ্ণবাণ ভীষ্মের উপাধান। অন্য বাণে পাতালগঙ্গার জল ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণ করছে। রাত্রি আসন্ন, একে একে কৌরবপক্ষ এবং পাণ্ডবপক্ষের সকলে ভীষ্মকে প্রণাম করে শিবিরে ফিরে গেছে। নির্জন সন্ধ্যায় একাকী শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম। আশে পাশে হিংস্র পশুর চীৎকার রাত্রির অন্ধকারকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। শ্মশানের আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ভীষ্মের দিকে। শিয়রের কাছে এসে থেমে গেল সেই মূর্তি। অতি ক্ষীণস্বরে বলল—পিতামহ!

ভীষ্ম ধ্যানমুদ্রিত চক্ষু মেলে তাকালেন।

—কে?

—কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনি যাকে কোনোদিনই পছন্দ করতেন না, আমি সেই সূতপুত্র কর্ণ।

ভীষ্ম দেখলেন বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে আছে কর্ণ। তার চোখে জল। ইঙ্গিতে কর্ণকে কাছে ডাকলেন ভীষ্ম, সস্নেহে বললেন—

—হে বীরোত্তম! তুমি কুন্তীপুত্র। পাণ্ডবদের ভাই। নারদের মুখে শুনেছি তোমার জন্মকথা। তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই। তুমি দুর্যোধনের হীন সংসর্গে পরশ্রীকাতর হয়ে উঠেছিলে, তাই তোমাকে কটুবাক্য বলতাম। আমার অনুরোধ তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হও। সব বৈরিতার অবসান হোক।

—তা আর হয় না পিতামহ। আমি দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমার শেষ পরিণতি আমি জানি। হে মহাত্মন্! এতদিন ক্রোধে উত্তেজনায় কিংবা চপলতাবশত আপনাকে যে অপমান করেছি, আপনি দয়া করে ক্ষমা করুন।

কর্ণের পরামর্শে ও সকলের সম্মতিকে এবার দ্রোণ হলেন সেনাপতি। কর্ণ এবার রণাঙ্গনে। রণাঙ্গনে কর্ণপুত্র বীর বৃষসেনও। সেনাপতি বৃদ্ধ কিন্তু যোদ্ধারা তরুণ। ভীমপুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধে কৌরবরা থরহরি কম্পমান। কর্ণ একাগ্নি বাণে নিহত করলেন ঘটোৎকচকে। পাণ্ডবশিবিরে হাহাকার।

আচার্য দ্রোণের পতনের পর কৌরব পক্ষের সেনাপতি হলেন মহাবীর কর্ণ। সুবর্ণ নির্মিত বিজয় ধনুকে টঙ্কার দিয়ে মকরব্যূহ রচনা করে কর্ণ যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিল। তার রথে উড়ছে শ্বেত পতাকা-ধ্বজা চিহ্ন হস্তীবন্ধন রজ্জু। শ্বেতপতাকা কেন? তবে কি কর্ণ যুদ্ধ চায় না? কিংবা যুদ্ধ চায় শুধু শৌর্য ও পরাক্রম প্রকাশের জন্য। কর্ণের অন্তরই জানে এর উত্তর। মাতা কুন্তীকে তিনিতো কথা দিয়েছিলেন চিরদিন কুন্তী থাকবেন পঞ্চপুত্রের জননী। সেদিন সেই নির্জন যমুনা তীরে জননীর আশীর্বাদরূপে কর্ণ শিরে তুলে নিয়েছেন আপনার মৃত্যু। কেউ জানে না। কেবল সাক্ষী তাঁর অন্তর, আর দেব দিবাকর।

কর্ণতো ভীমকে পরাস্ত করেছিলেন অনায়াসে তাঁকে নিহত করতেও পারতেন। আর ভীম নিহত হলে যুদ্ধের গতিই পালটে যেত। কিন্তু তবু কর্ণ একটু করুণ হেসে ভীমকে বধ না করে ছেড়ে দিয়েছিল।

অর্জুনকে বধ করবার জন্যে যে একাগ্নি বাণ তার কাছে ছিল সেই বাণ অর্জুনের প্রতি প্রয়োগ করলেন না। অথচ এই বাণ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণেরও চিন্তার অন্ত ছিল না। ভীষ্মের সেনাপত্যের দশ দিন ছাড়াও দ্রোণের সেনাপত্যে চারদিন কর্ণ যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু সেই একাগ্নি বাণের প্রয়োগ করেননি। অবশেষে ঘটোৎকচকে বধ করার জন্য ওই বাণ প্রয়োগ করেন। শুনে ধৃতরাষ্ট্র মন্তব্য করেছিলেন —এইভাবে কর্ণ নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনল?

কর্ণ কি তা ভাবেননি?

তাছাড়া অর্জুনের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে তক্ষক নাগ কর্ণকে বলল—

—তুমি আবার বাণ নিক্ষেপ কর। আমি যোগবলে তোমার বাণের মধ্যে ঢুকে অর্জুনকে বধ করব।

অর্জুনকে বধ করার এই শেষ সুযোগও কর্ণ গ্রহণ করলেন না। বললেন—

—আমি অন্যের সাহায্য নিয়ে শত্রুকে বধ করব না।

অর্জুনকে বধ করা হয়তো কর্ণের অভিপ্রায় ছিল না। অর্জুনের সামনে রথ স্থাপিত করে কর্ণ সারথি শল্যকে ম্লান হেসে প্রশ্ন করল—

—শল্য! তুমি সত্যি করে বল আজ যদি অর্জুন আমাকে নিহত করে তুমি কী করবে?

এই কথা বলে কর্ণ প্রকারান্তরে তাঁর নিজের মৃত্যুর সংকেতই জানিয়ে দিলেন। বস্তুত কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের কাউকেই বধ করতে চায়নি। একের পর এক সুযোগ এসেছে কিন্তু কর্ণ গ্রহণ করেননি।

নকুল অস্ফালন করে কর্ণের সঙ্গে সংগ্রাম করতে এসেছেন, পরাজিত হয়েছে, কিন্তু কর্ণ হাতে পেয়েও নকুলকে বধ করলেন না। তারপর যুধিষ্ঠির কর্ণকে আক্রমণ করলেন, বললেন—

—কর্ণ! তোমার মতো বীরত্ব আর পাণ্ডবদের প্রতি যত বিদ্বেষ আছে আজ তা দেখাও।

দুজনের ভীষণ যুদ্ধ হলো। যুধিষ্ঠিরের কবচ বিদীর্ণ। তিনি

আহত, রক্তাপ্লুত। রথ ও ধ্বজ ভঙ্গ। বিষণ্ণ যুধিষ্ঠির অন্য একটি রথে উঠে পলায়ন করছেন। কর্ণ ছুটে গিয়ে দৃঢ় হস্তে তাঁর স্কন্ধ স্পর্শ করে বললেন—

—যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে না। তুমি যাগযজ্ঞ, বেদপাঠ কর, ব্রাহ্মবলে কুশল, তাই বলে কখনো যুদ্ধ করতে এসো না। আর আমাকে কোনোদিন অপ্রিয় বাক্য বলো না। শোন রাজা, আমি তোমাকে বধ করবো না।

কেননা কর্ণ মনে মনে চেয়েছেন রাজা হোক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধ। ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র নিহত। কেবল দুর্যোধন জীবিত। কর্ণ দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করলেন অর্জুনকে। আরতো কর্ণের অপেক্ষা করার সময় নেই। দুর্যোধনের মৃত্যু কর্ণ নিজের চোখে দেখতে পারবেন না। দুর্যোধনকে কর্ণ বললেন—

—মিত্র! কেবল শৌর্য আর পৌরুষ ছাড়া আজ আর আমার কিছু নেই। আমি নিজে অরক্ষিত। সহজাত কবচকুণ্ডল হারিয়েছি। শেষ হয়েছে ইন্দ্রের একাগ্নি বাণ। অবশিষ্ট আছে শুধু পরশুরাম প্রদত্ত আমার এই বিজয় ধনু আর মৃত্যুভয়হীন বীরের হৃদয়।

কর্ণ মনে-মনে নিজের মৃত্যুচিন্তাই করছেন। তবুও তাঁর মুখে সেই করুণ হাসিটুকু লেগে আছে। তাঁর কথায় নয়, আচরণেও নয়, কর্ণের ওই ম্লান হাসির মধ্যেই রয়েছে তাঁর প্রকৃত আত্মপরিচয়।

কর্ণ-অর্জুনের এই যুদ্ধে দুই পক্ষ দুই দিকে। ব্রহ্মা তাই বললেন কর্ণ দানবপক্ষ আর অর্জুন দেবপক্ষ। তাই অর্জুনের জয় হবে। ব্রহ্মা-মহেশ্বর-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অন্তরিক্ষ থেকে এই যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। কৃষ্ণ বার বার চেষ্টা করেছেন কর্ণকে কৌরবপক্ষ থেকে পাণ্ডবপক্ষে নিয়ে আসতে। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছেন কর্ণ উঠে আসুক তাঁর পিতৃযান থেকে দেবযানের পথে।

অর্জুনের অগ্নিরথ কর্ণের রথের অগ্রভাগে প্রতিহত হলো। উভয়ের শ্বেত অশ্বের গ্রীবায়-গ্রীবায় সংঘর্ষ ঘটল। অর্জুনের ধ্বজা থেকে মহাকপি সবেগে লম্ফ দিয়ে আক্রমণ করল কর্ণের ধ্বজা লাঞ্ছনা।

ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। অর্জুন ভয়ংকর আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডল ব্যাপ্ত হয়ে আগুন জ্বলে উঠল। সেই অগ্নিতে প্রজ্বলিত সৈন্যগণ আর্তনাদ করতে লাগল। কর্ণ তৎক্ষণাৎ বরুণ অস্ত্রে অর্জুনের আগ্নেয় অস্ত্র ব্যর্থ করে দিল। অর্জুন ইন্দ্রের বজ্রমহেন্দ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কর্ণের ভার্গব অস্ত্রে তা নিষ্ফল হলো।

শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—পার্থ, তোমার দিব্যাস্ত্র সকল নিষ্ফল হচ্ছে কেন? আবার কি তোমার মোহ উপস্থিত হয়েছে?

ভীম হতাশ উত্তেজিত হয়ে বললেন—

—অর্জুন, তোমার অস্ত্রসকল নিবারিত হচ্ছে। শত্রুরা হর্ষধ্বনি করছে। যদি তুমি না পার ছেড়ে দাও আমি কর্ণকে বধ করি।

অর্জুন বললেন—

—কৃষ্ণ! তুমি অনুমতি দাও, দেবগণ অনুমতি করুন, আমি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে এই উগ্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলাম। কিন্তু এবারও অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত হলো।

অর্জুনের গাণ্ডীবের গুণ বারবার ছিন্ন হতে লাগল। অর্জুন শরাহত হলেন, কৃষ্ণ বাণাহত।

কর্ণ তখন তাঁর সর্পবাণ যোজনা করলেন। সেই বাণে পাতাল থেকে তক্ষক নাগ যোগবলে প্রবেশ করে আছে। কর্ণ তা জানেন না। সারথি শল্য দেখলেন, এইবাণ অর্জুনের মৃত্যুতুল্য, তাই কর্ণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলল—কর্ণ, তুমি অন্যবাণ প্রয়োগ কর। এই বাণে অর্জুনের কিছু হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ প্রমাদ গুনলেন, করাল অগ্নির মতো সেই সর্পবাণ আকাশ কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। তিনি তড়িৎগতিতে পদাঘাতে অর্জুনের রথ একহস্ত পরিমাণ মাটিতে প্রোথিত করে দিলেন। হেম আভরণ ভূষিত রথের অশ্বগুলি নতজানু হয়ে ভূমি স্পর্শ করল। কর্ণের সর্পবাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কিন্তু অর্জুনের মাথার সোনার মুকুটখানি ছিন্ন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল।

সর্পবাণ ব্যর্থ হলে তক্ষক স্বমূর্তিতে কর্ণের সামনে গিয়ে বলল—

—হে বীর, তুমি অন্যমনস্ক ছিলে তাই আমাকে দেখতে পাওনি। তুমি আবার বাণ নিক্ষেপ কর। আমি তোমার বাণে প্রবেশ করে অর্জুনকে নিহত করবো।

কর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—

—কে তুমি ভয়ংকর নাগ?

—আমি তক্ষকপুত্র অশ্বসেন। এই অর্জুন আমার মাতৃহন্তা। আমি অর্জুনের শত্রু। তুমি বাণ নিক্ষেপ কর। আমি এবার অর্জুনকে বধ করব।

কর্ণ বললেন—

—হে তক্ষক আত্মজ। কর্ণ যুদ্ধে কখনো অন্যের সাহায্য নিয়ে জয়লাভ করে না। আর শত অর্জুনকে বধ করতে হলেও কর্ণ এক বাণ দুবার ব্যবহার করে না। তুমি এখন যেতে পার।

তখন অর্জুন যমদণ্ড তুল্য এক লৌহবাণে কর্ণের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। কর্ণের দেহ অবসন্ন। মুষ্টি শিথিল। হাত থেকে পড়ে গেল ধনুর্বান। কর্ণ বজ্রাহত পর্বতের মতো টলতে লাগলেন। সর্বাঙ্গে তাঁর রক্তধারা। অস্ত্রহীন, দুর্বল।

অস্ত্রহীন, আহত কর্ণকে আঘাত করতে অর্জুনের হস্ত উত্থিত হচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

—পার্থ! প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না। দুর্বল শত্রুকে অবসর দিতে নেই। বিলম্ব করো না, শত্রুকে বধ করো।

তখন কর্ণের শ্রবণে এল অদৃশ্য মহাকালের বজ্রনির্ঘোষ ব্রাহ্মণের অভিশাপ—

—মৃত্যুকাল সমুৎপন্ন হলে মেদিনী তোর রথচক্র গ্রাস করবে।

গুরু জামদগ্নির অভিশাপ —সংকটকালে সকল অস্ত্রবিদ্যা বিস্মৃত হবে।

হঠাৎ প্রচণ্ডশব্দে মেদিনী বিস্ফারিত হয়ে কর্ণের রথচক্র বসে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা তিনি বিস্মৃত হয়ে গেলেন। রাগে দুঃখে কর্ণের নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। অর্জুনকে উদ্দেশ করে কর্ণ বললেন—

—অর্জুন, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। মেদিনীর গ্রাস থেকে আমাকে রথচক্র উদ্ধার করতে দাও। তুমি মহাক্ষত্রিয়, ধার্মিক। নিরস্ত্র রথীকে আক্রমণ করা অধর্ম। অতএব, হে অর্জুন, তুমি আমাকে একটু সময় দাও।

শ্রীকৃষ্ণ তখন কর্ণকে বললেন—

—কর্ণ! তুমি আজ দৈবের নিন্দা করছ, ধর্মের দোহাই দিচ্ছ? কিন্তু যেদিন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় অপমান করেছিলে সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? শকুনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শঠতায় কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? তোমার সম্মতিতে দুর্যোধন যেদিন বিষ প্রয়োগে ভীমকে হত্যা করতে গিয়েছিল সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যুদ্ধের নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে যেদিন সপ্তরথী মিলে একা নিরস্ত্র, বালক অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলে সেদিন তোমার ন্যায়নীতি ধর্ম কোথায় ছিল?

কর্ণ নতমস্তক, নিরুত্তর, হয়তো অনুশোচনায় দগ্ধ।

অর্জুন তখন শিবের পিনাক, নারায়ণের সুদর্শন তুল্য, কালাগ্নি সম ভীষণ আঞ্জলিক বাণ ধনুতে যোজনা করে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেন—''যদি আমি তপস্যা ও যজ্ঞ করে থাকি, সুহৃদগণের বাক্যের মর্যাদা দিয়ে থাকি, গুরুসেবা করে থাকি তাহলে এই বাণ আমার শত্রুর প্রাণ সংহার করুক।

ভয়ংকর শব্দে সেই প্রজ্বলিত বাণ কর্ণের মস্তক ছেদন করল। ছিন্নশির মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তাক্ত সূর্যেদেব যেন অস্তাচল থেকে পতিত হলো। নিহত পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে ম্লান মন্দরশ্মি নিয়ে অস্তাচলে বিলীন হলেন দেব দিবাকর। পাণ্ডব শিবিরে এই সংবাদ পৌঁছালে আরও একজনের বুকফাটা আর্তনাদ শোনা গেল তিনি জননী কুন্তী।

With Best Compliments from -

SHILPA METAL INDUSTRIES

AN ISO CERTIFIED COMPANY 9001:2015

B-5, Friends Industrial Estate. Opp. Aarti Steels,
Focal Point, Sherpur, Ludhiana - 141010

Manufactures of High Quality SHOVELS & FASTENERS

Phone ; +91 98559 77770,
E-mail : salesexport@muwo.co.in, abhishekgsmi@gmail.com
Website : www.muwo.co.in

ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা

সত্যানন্দ গুহ

মধুমিতার চোখে তীব্র তেজ। শরীরের সমস্ত রাগ ঘৃণা মুখে জমেছে। মুখটা মেঘলা আকাশের মতো থমথমে। 'নারীর পথে' বইটি ছুঁড়ে ফেলল। বলল, তোমার মন সংকীর্ণ। ভালোবাসার কোনো জাত-ধর্ম নেই।

জ্বালাতে এলে? উপন্যাসটা শেষ করতে না পারলে মান-সম্মান সব যাবে। বিরক্তি প্রকাশ করে পুণ্যব্রত।

আমার তাতে কী? তোমার মতিগতি বুঝেছি। অনুলোম-প্রতিলোম বিয়ে নিয়ে আদর্শ দেখাচ্ছ। আমাকে বিয়ে করতে চাও না। এই তো? রাগ রাগ ভাব চোখে মুখে।

হ্যাঁ, তাই, এ পাপ, এ অন্যায়। তুমি ছাড়া আমার জীবন বৃথা, শূন্য। তুমি আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে, হৃদয় জুড়ে। তবুও

অবুঝ হয়ো না। সান্ত্বনা দেয় পুণ্যব্রত।

ফাঁকা দুপুর, নির্জন নিরালা। বাড়ির আর সবাই সিনেমায়। অঘ্রান মাস। না শীত না গরম। খদ্দরের একটা পাতলা চাদর গায়ে। 'ভালোবাসার বৃত্তে' উপন্যাসটা লিখছিল। পাকা ধানের রঙের রোদ ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মধুমিতা ফাঁক খুঁজেই বসেছে।

ওসব তত্ত্বকথা আমি বুঝিনে। স্পষ্ট কথা—তোমাকে ভালোবাসি। তোমার প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারব না। মিথ্যায় ভুলিয়ো না। মধুমিতা গোঁয়ারের ভাব দেখায়।

তোমার বাবা সুপাত্র খুঁজছেন। আমি আর্যধর্মে বিশ্বাসী। চরিত্র নষ্ট করতে পারব না। লিখতে লিখতেই বলল পুণ্যব্রত।

পাঠকদের কাছে তুমি বলিষ্ঠ লেখক, সমাজে চরিত্রবান। আমার কাছে তুমি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। অন্য কেউ আমার শরীর পেতে পারে। মনটা তোমার ডালেই বসে থাকবে। ক্ষোভে দুঃখে তার মনে আগুন জ্বলে ওঠে। ব্যঙ্গ করে বলে—'নারীর পথে' বইটি দু'বার পড়েছি। শুধু আদর্শের কচকচি, জ্ঞানগর্ভ কথা। আমাদের মন মুখ এক না হলে, আদর্শ কেন্দ্রিক চরিত্র না হলে, আর্যধর্মকে না মানলে জীবনের স্তরে স্তরে ষড়রিপুর ঘুণপোকারা একদিন অস্তিত্ব বিনষ্ট করে দেবে। আরও কত কী আছে।

গোপনে হাসে পুণ্যব্রত। এদের কী বোঝাবো? প্রবৃত্তির দাস এরা। অনুভূতিও ভোঁতা। ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতাও নেই। লিটল ম্যাগাজিনের সীমা ছাড়িয়ে সম্প্রতি যে কমার্শিয়াল পত্রপত্রিকায় লিখছে। একজন বলিষ্ঠ লেখক হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে। অভিজ্ঞতায় টইটম্বুর। চেহারায় আত্মপ্রত্যয়শীল গাম্ভীর্য। সৌম্যদর্শন কান্তিময়। 'ভালোবাসার বৃত্তে' তার দ্বিতীয় উপন্যাস। জীবনের পরতে পরতে যে উপলব্ধি তারই পাকা ফসল। অনেক দেখে শুনে অনেক খেটেখুটে লেখা। এক মুখ হেসে বলে এ উপন্যাস তোমাকে ঘিরে। ভালোবাসা ও ভালোলাগার উত্তাপ মিশ্রিত উপলব্ধি।

পুণ্যব্রতের বহু লেখা ও পড়েছে। কোথাও নিজের চরিত্র খুঁজে পায়নি। ফ্রক পরা অবস্থায় পেন্সিল স্কেচ দিয়ে খাতায় একটা ছবি এঁকে দিয়েছিল মাত্র। পুণ্যব্রত ওর নতমুখের দিকে তাকাল। বলল—এ বইটির মূলকথা, ভালো জমিতে ভালো ফসল হয়, খারাপ জমিতে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। পশুপাখির বেলায় ভালো বীজ, ভালো ক্ষেত্র খুঁজব; মানুষের বেলায় মানব না? বিয়েটা ঠিকঠাক হলে নারীর গর্ভ হতে সুসন্তান জন্মায়। না হলেই অধম, ইতর, বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ কুসন্তান জন্মায়।

ফোঁস করে ওঠে মধুমিতা। পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। উত্তেজিত সুরে বলে ছাই পাঁশ লিখছ। আগুন ধরিয়ে দেব। লেখার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করছেন। স্বয়ং অবতার যেন। তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ কথার মধ্যে।

একি করলে? অবুঝ হয়ো না। মুখের সঙ্গে হাত চলছে কেন? রেগে ওঠে পুণ্যব্রত। মন মেজাজ খিঁচড়ে গেল। এই মেয়ের এত সাহস। দু'বছর আগেও ফ্রক পরে স্কুলে যেত। এক ঝাঁক মেয়ের মধ্যে প্রজাপতির মতো দেখাত। চোখ ফেললে চোখাচোখি হতো। কলেজে উঠেই সাহসী হলো। একদিন মুখোমুখি হল। বলল, আপনার 'প্রথম প্রহর' উপন্যাস দু'বার পড়েছি। আমাদের বাড়িতে একদিন আসুন না। মা খুব মাই ডিয়ার লোক।

পুণ্যব্রত কথা রেখেছিল। অষ্টাদশী, মধুমিতার যৌবন তাকে দোলা দিয়েছিল। একদিন দু'দিন নয়, বহুদিন গিয়েছিল। বুকের কৌটোয় সে সব স্মৃতি সযত্নে রক্ষিত। একদিন ওমলেট খেতে দিলে বলেছিল—নিরামিষ খাও, শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। নীরোগ ও কর্মঠ হবে। আয়ু দীর্ঘ হবে, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও নানা মানবিক শক্তি দৃঢ় হবে।

মধুমিতা টিপ্পনী কাটে একেবারে বৈষ্ণব। অল্প বয়সেই ধর্মকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমার দ্বারা এ বয়সে ওসব হবে না।

বাজে বকছো। পৃথিবীতে কত লোক আমিষ খায় খোঁজ রাখো? মাদ্রাজী, সিন্ধী, গুজরাটি, মারাঠিদের স্বাস্থ্য দেখেছো? বৈষ্ণব ও বিধবাদের শরীর অপেক্ষাকৃত নীরোগ। পৃথিবীর বহু দার্শনিক, শিল্পী ও মহাপুরুষ নিরামিষাশী। পূজাপার্বণে নিরামিষের বিধান কেন? দৃঢ় কণ্ঠে আত্মোপলব্ধি নিয়ে বলেছিল পুণ্যব্রত।

নানা ব্যথা ওর মনে। পুণ্যব্রতের জন্য দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে। অন্য পুরুষে মন বসাতে পারে না। সোমত্ত মেয়ে। যৌবনের ভীরু ক্ষুধায় নানা গোপন ইচ্ছে জাগে। সুযোগ খোঁজে। বাড়ির পেছনে সুন্দর সাজানো বাগান। গাছে গাছে কুল, পেয়ারা। মৌ মৌ গন্ধ। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ।। প্রেম জেগে ওঠে। পাশেই মাংসল তাজা যৌবন। নিঝুম নিরালা পরিবেশ। পুণ্যব্রত এই মুহূর্তে যা খুশি করতে পারে। ধর্মভীরু সে। মতিভ্রমে যোগভ্রষ্ট হলো না। জীবনব্রত ভঙ্গ করলে তার সাধনা মিথ্যা হয়ে যাবে। ওকে নীল শাড়িতে কেমন পবিত্র দেখাচ্ছিল। লোভের গন্‌গনে আগুনটাকে চাপা দিল সে। সান্ত্বনা দিল মনকে—মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা না হলে মেয়েদের ছুঁতে নেই। মেয়েদের শরীর পবিত্র রাখলে মন্দির, অপবিত্র করলে নরক। ধর্মগ্রন্থে ঠিক এমন কথাই আছে। এমনি করেই কুমারী মেয়েরা দুর্বল হয়ে অসতর্ক মুহূর্তে অপবিত্র হয়ে যায়।

মধুমিতা ওকে ভীতু, নাবালক ভাবল। অন্য ছেলেরা তাকে খাই খাই করে। পুণ্যব্রত আশ্চর্য ব্যতিক্রম। শ্রদ্ধায় ওর মাথা নত হয়ে যায়। ঘোর কাটলে

বলে—তুমি জিতেন্দ্রিয় সংযমী ধর্ম পুরুষ। তোমাকে নিয়ে যে কোনো মেয়ে, যে কোনো স্থানে, যে কোনো সময়ে একাকী যেতে পারে।

দীর্ঘদিন মধুমিতা ভীরু ক্ষুধায় ভুগছে। কামনা বাসনা তার অতৃপ্ত। পুণ্যব্রতের কঠোর সংযম, অহংকারী ব্যক্তিত্ব ভালো লাগত না। আজ ওর ব্রত ভঙ্গ করবেই। কোমর বেঁধে মনকে শক্ত করে এসেছে। ভীরু ক্ষুধা মেটাতে চায়। এ ক্ষুধার জন্ম ও লয় অন্ধকারের মধ্যেই। সভ্য পৃথিবীতে এ ক্ষুধা ধ্রুবসত্য হয়েও চালাকি করে গোপন করতে চায়। না বোঝার ভান দেখায়। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাল—তুমি বোনকে কী বলেছ?

সংযম উত্তর এল—ও বলেছিল দিদির মাথা খাচ্ছেন কেন? বাবা পাত্র খুঁজছেন। দিদির ঘোর আপত্তি। আপনাকে ছাড়া বিয়ে করবে না।

তুমি কী বললে? শাস্ত্র হতে কী কী মুখস্থ বললে? বাঁকাস্রোতে কথা ঢালে মধুমিতা।

মেয়ে হলেই বিয়ে করা যায় না। অনেক বাধা, অনেক কারণ আছে। বিবাহিত জীবনের উপরই আমাদের সমস্ত জীবনের দুঃখ সুখ নির্ভর করে। বিয়েটা বাজারের সওদা নয়। দু' একদিনের ব্যাপার নয়।

জানি আমাকে তুমি বিয়ে করতে চাও না। আমি দ্বিজ, তুমি অ-দ্বিজ। প্রতিলোম বিয়ে তোমার কাছে অশাস্ত্রীয়। তাই তো? অভিনয়ের ঢঙে এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করে।

মিছে রাগ করছ! আমাকে ভুল বুঝছো; তুমি গুণবতী পদ্মিনী পাত্রী। তোমার মতো পাত্রী পেলে জীবনে সুখীই হতাম। উপায় নেই। কথার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে।

গোপন কান্নায় ভেঙে পড়ে

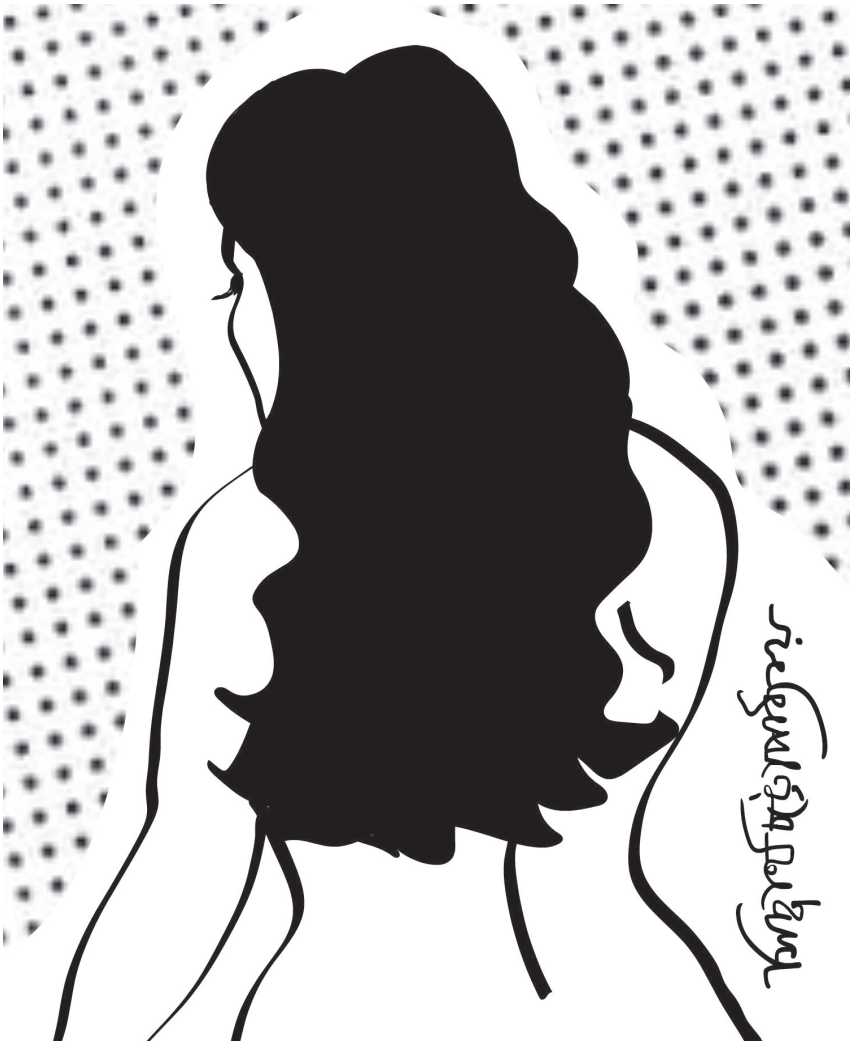

মধুমিতা। প্রশ্ন তোলে প্রতিলোম বিয়ে কি রামায়ণ মহাভারতের যুগে হয়নি? সে যুগে তো একাধিক বিয়েও হত। ভীম, অর্জুনরা তো রাক্ষসদের মেয়েও বিয়ে করেছিল। অনুলোম বিয়ের সত্যতা, যুক্তি খোঁজে সে।

ওরা একটি সবর্ণে, অন্যটি নিম্নবর্ণে বিয়ে করেছে। বিশেষ প্রয়োজনে পুরুষের সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকলে একাধিক নারী গ্রহণ করতে পারে। উচ্চবর্ণের ছেলেরা যে কোনো বর্ণের মেয়ে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু উচ্চবর্ণের মেয়েরা নিম্নবর্ণের ছেলেদের বিয়ে করতে পারবে না। প্রতিলোম বিয়েতে জাতি ধ্বংস হয়, রাজ্য ধ্বংস হয়, সমাজের বাঁধন ভেঙে যায়। সংসার অধঃপাতে যায়। নানা রোগ ব্যাধি আশ্রয় নেয়। বংশে অকালমৃত্যু হয়। আরও নানা ক্ষতি হয়। গ্রিস-রোম-ফ্রান্স-ইটালি এ ভাবেই ধ্বংস হয়েছে। জার্মানির পরাজয়ের মূলেও তাই। জার্মানির নোবেল বিজয়ী বৈজ্ঞানিক কার্ল রেইস্টেইনার তাঁর বইতে এসব শাস্ত্র কথা ব্যাখ্যা করেছেন।

পুণ্যব্রত শরীরের সম্পর্ক পাতেনি। খুবই সতর্ক। নানাভাবে এড়িয়ে যেত। কেউ কাউকে ভুলতে পারে না। মেয়েরা পূর্ব- প্রণয়ীদের ভুলতে পারে যদি পরবর্তী প্রণয়ীরা পূর্বাপেক্ষা ধনী ও গুণী হয়। মধুমিতা পুণ্যব্রতের মতো শিক্ষিত,

চরিত্রবান ও গুণী লোক দ্বিতীয়টি পায়নি। আর কেউ স্বামী হওয়ার উপযুক্ত নয়। কান্নাভেজা গলায় বলে শাস্ত্র আজকাল অচল। একজন অখ্যাত দ্বিজের চেয়ে খ্যাতিমান অ-দ্বিজের রক্ত অনেক পরিশ্রুত। আমাকে আর ঠকাবে না। কাতরভাবে তাকায় ওর দিকে।

ভারতীয় শাস্ত্র তার নখদর্পণে। তার সাধনার, জীবনদর্শনের উপলব্ধি দিয়েই সাহিত্য। কম্প্রোমাইজ করতে পারল না। কঠিন সুরে বলল—শাস্ত্র মনগড়া জিনিস নয়। আমাদের বাঁচতে-বাড়তে যা যা লাগে তা নিয়েই শাস্ত্র। তত্ত্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী মুনিঋষিরা এসব বিধিবিধান দিয়ে গেছেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। একজন দ্বিজও যতই হোক অধঃপতন হতে পারে না।

বেলা বয়ে যায়। সারা দুপুর মাটি হয়। রোদ প্রায় মুখ তুলে নিয়েছে। আলো-আঁধারের মায়াবী সন্ধিক্ষণ। পাখিদের ঘরে ফেরার লগ্ন। কার্নিশে চড়ুইগুলি কিচির মিচির লাগিয়েছে। ওর মুখে চোখে ব্যথা জেগে ওঠে। বলে তুমি শিক্ষিত মানুষ, শিল্পী। কেন ভেদাভেদ সৃষ্টি করছ? আজকাল কেউ এসব মানে না। তোমার কাকা কেন হরিপদ বিশ্বাসের মেয়েকে বিয়ে করলেন? রূপসী না ধনী বলে?

ওতো অনুলোম বিয়ে। এর দ্বারাই নিম্নজাতি উন্নত হতে পারে। পশুপাখির বেলাতেও উচ্চ পুরুষ-বীজ, নিম্ন স্ত্রী-ক্ষেত্রে দিয়ে উন্নত প্রসব করানো হয়। এসব কথা আজ ঘরে ঘরে জনে জনে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।

এবার রেগে যায় মধুমিতা। কেউটের মতো বিষ ঢেলে দেয়। ঝংকার দিয়ে বলে তোমার মাথা মুণ্ডু। তোমার সব অহংকার আজ চূর্ণ করে দেব। মিথ্যা স্তোক দেওয়ার জন্য কিছু বুলি মুখস্থ রেখেছো। তোমার চরিত্র, নিষ্ঠা আজ বালিয়াড়ি করে দেব। আত্মীয় স্বজনদের কাছে মাথা নীচু করে দেব। যোগব্রত সন্ন্যাসীর ভড়ং ভেঙে দেব। প্রেমের কাছে পাপ পুণ্য নেই। আদর্শ সংস্কার নেই। আমি তৃষ্ণার্ত, অতৃপ্ত। আজ সব মিটিয়ে নিতে চাই, কড়ায় গণ্ডায়। চোখে কেমন তীব্র চাহনি, সুরে ব্যঙ্গ, চাঞ্চল্য।

দুষ্ট গ্রহণের মতো গ্রাস করতে চাও? ব্রত ভঙ্গ করতে চাও? এত নিষ্ঠুর হয়ো না মিতা। সামনে তোমার বিয়ে। অন্যপুরুষে নিবেদিতা। মান সম্মান লজ্জা ঘৃণা তোমার নেই? মা বাবার মুখে কলঙ্ক দিতে চাও? জীবনে সুখী হতে পারবে না। কী লাভ এঁটো হয়ে? স্বামী তোমার পূরণকারী পুরুষ। আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত দিকই স্বামী পূরণ করে। তাকে নৈবেদ্য দিও। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করে পুণ্যব্রত। ঘরের মধ্যে যেন মেঘ নেমে এসেছে। সুইচবোর্ড গার্ড করে মধুমিতা দাঁড়িয়ে। আলো জ্বালাতে দেবে না!

যা খুশি বকে যাও। যত খুশি জ্ঞান দাও। আমার কাছে ভালোবাসার জাতবর্ণ নেই। আমাকে দুঃখ দিলে অধর্ম হবে। ধর্ম কারও অস্তিত্ব নষ্ট করে না। বিশুদ্ধ চরিত্র নিয়ে শিল্পী হওয়া যায় না, শিল্পীরা জীবনকে নানাভাবে দেখে। এসব তুমিই আমাকে বলেছিলে।

পুণ্যব্রত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো। উত্তেজিতভাবে বলল ধর্ম-অধর্ম আমাকে শেখাতে হবে না। শিল্পীরা জীবনকে নানাভাবে ভোগ না করেও দেখতে জানে। বিশেষ চোখ থাকা চাই। চলা-বলা-করা ঠিকভাবে না হলে পতন কেউ রোধ করতে পারে না। সংযম ছাড়া জীবনে ধর্ম টেকে না।

ধ্যাত, শুধু জ্ঞানগর্ভ কথা। ধর্মের কচকচি। কুইক প্লিজ, ধার্মিক প্রবর। বলেই ব্রেসিয়ারে হাত দিল। এক এক করে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল। নির্লজ্জ বেহায়া হলো।

প্রমাদ গুনল পুণ্যব্রত। একটা মেয়ের জন্য করায়ত্ত শত যশ নষ্ট হবে? শরীর ছুঁইয়ে একটা নগ্ন দেহ। যৌবন বন্যায় টলটল করছে। চারদিকের পরিবেশ শান্ত। ঝড় ওঠার আগের অবস্থা। যা খুশি করার অপূর্ব সুযোগ। বুক ধুকপুক করতে লাগল। কী করবে ভেবে পেল না। এমন শক্ত পরীক্ষা জীবনে দেয়নি। কেউ দেখলেই রাষ্ট্র হয়ে যাবে। পাপপুণ্যের দোলায় দুলতে লাগল। দূরে কাদের পদধ্বনি শুনতে পেল। পুণ্যব্রতের বাড়ির লোক হতে পারে। কম্পিত হাতে ওর মাথাটা ধরে আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়াল পদ্ম পাপড়ির মতো কোমল গালে। নাথিং এল্‌স বলে জামাকাপড়গুলি হাতে ছুঁড়ে দিল। বি রেডি প্লিজ। বাড়ি যাও। মা ওরা আসছেন বোধ হয়। এটাই প্রসাদ, স্মৃতি হয়ে থাক। তুমি কুমারী, এর বেশি পাপ, ঘোর অন্যায়। লক্ষ্মীটি আমায় ক্ষমা করো।

মধুমিতা ওকে প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম হতে দেখল। অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। পীড়াপীড়ি করা মিছে। কৌমার্য ও নষ্ট করবে না। সব দেবতার এক প্রসাদ নয়। বুঝতে পারল পুণ্যব্রতের যশ, মান, খ্যাতি তাকে অহরহ জ্বালাবে। জীবনটা ধূপকাঠির মতো নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পুণ্যব্রত বিয়ে না করলে তবু মনে রাখবে। বিয়ে করলেই নিষ্ঠুরভাবে ভুলে যাবে। আরও নানা চিন্তা মাথায় জট-বাঁধে। এ হয়তো শেষ দেখা, শেষ কথা। মনের মধ্যে অনেক মেঘ জমে কালো ঘন হয়ে গেছে। জল ভরা আকাশের মতো ভারাক্রান্ত মনে ঘরের বাইরে পা ফেলল। দ্রুত পা চালাল। ঘরে ফিরে বিছানায় মনের সমস্ত মেঘ জল হয়ে ঝরে পড়বে। ভেজা ভেজা চোখে সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে উঠল।

খুড়োমশাই

সিদ্ধার্থ সিংহ

খুড়ে খুড়োমশাই এক মুহূর্তের জন্যও বালিশটাকে হাতছাড়া করেন না। মাথায় দিয়ে তো শোনই, মনে হয় ঘুমের মধ্যেও ধরে থাকেন। সকালে নিম দাঁতন করার সময় হাতের কাছাকাছিই রাখেন। স্নান করতে যাওয়ার আগে রোদে বসে গায়ে তেল মাখার সময়ও চোখে চোখে রাখেন। পুকুরে ডুব দিতে যাওয়ার

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

আগে, পাড়ে উঠে পরার জন্য নিয়ে যাওয়া ধুতি দিয়ে ভালো করে ঢেকে রেখে যান। যাতে কারও নজরে না পড়ে। খেতে বসার সময়ও পাশে রেখে যান। কোথাও বসলে কোলে নিয়ে বসেন।

বাড়িতে তাঁর চার-চারটে ভাই। বয়সে তাঁর চাইতে ঢের ছোট হলেও সকলেই প্রায় বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁদের একগাদা ছেলে-মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে-থা হয়ে গেছে। তারা নাতি-নাতনি নিয়ে সব ঘরসংসার করছে। ছেলেগুলোও বিয়ে করে বউমা নিয়ে এসেছে ঘরে। তাদের ঘরেও বাচ্চাকাচ্চা থিকথিক করছে। তারা কেউই ওই বালিশটার দিকে এত দিন ফিরেও তাকায়নি। একেবারে তেলচিটে হয়ে গেছে।

যেহেতু খুড়োমশাই একা, বিয়ে-থা করেননি—তাই ভাইবউ, বউমা, এমনকী তাদের ঘরের মেয়েরাও মাঝে মাঝে তাঁকে বলে, হ্যাঁগো খুড়োমশাই, দাও না বালিশটা। তুলোটুলো বের করে বালিশের খোলটা একটু কেচে দিই। শুকিয়ে গেলে আবার না হয় ওই সব ভরেটরে আগের মতো করে দেব গো। ওটার গন্ধে যে তোমার কাছেই ঘেঁষা যায় না—

কিন্তু তাতেও তাঁর ঘোর আপত্তি। বালিশের খোল তো দূরের কথা, বিশ্বাস করে কাউকে বালিশের ওয়ারটা পর্যন্ত মনে ধরে খুলে দিতে পারেন না তিনি।

কী এমন ধনসম্পত্তি আছে গো ওটার মধ্যে যে, সারাক্ষণ বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াও? কেউ এ ধরনের কোনও প্রশ্ন করলেই উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সে আছে একটা জিনিস। কিন্তু সেটা যে কী জিনিস, কাউকেই উনি সেটা খোলসা করে বলেন না। আর বলছেন না দেখেই এখন সবার নজর গিয়ে পড়েছে ওই বালিশটার ওপরে। কী আছে ওটার মধ্যে! কী আছে!

এই কৌতূহলটা হওয়াই স্বাভাবিক। আসলে, এই পরিবারের পুরুষদের মধ্যে বালিশে করে কিছু রেখে যাওয়ার একটা বাতিক আছে। এই খুড়োমশাইয়ের বাবাও বুড়ো বয়সে যে বালিশটা মাথায় করে শুতেন, রোগশয্যায় থাকার সময় তিনি একদিন তাঁর ছেলে-মেয়েদের ডেকে বলেছিলেন, শোন, আমি যখন মারা যাব, তখন কিন্তু অন্যান্য বাড়ির লোকেদের মতো আমার সঙ্গে বিছানাপাটি দিলেও এই বালিশটা কিন্তু কিছুতেই দিও না।

বড় ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন বাবা?

মেজ ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন, এর মধ্যে কি কিছু আছে?

সেজ ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা হলে এটা কী করব?

খুড়োমশাইয়ের বাবা বলেছিলেন, এর মধ্যে একটা নামাবলী আছে। আমি মারা গেলে এই বালিশটা আমার ছোট ছেলেকে দিয়ে দিস। দশ দিনের দিন ও যখন ঘাটকাজ করবে, তখন যেন এই বালিশটার ভিতর থেকে নামাবলীটা বের করে সেটা গায়ে দিয়েই আমার কাজ করে, কেমন?

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কথামতোই দশ দিনের দিন যখন নামাবলী বের করার জন্য ছোট ছেলে ওই বালিশটা ছিঁড়ল, দেখা গেল, নামাবলী কোথায়? বালিশের মধ্যে শুধু গাদা গাদা টাকা।

তাই বালিশের মধ্যে নামাবলী বা ওই জাতীয় কিছু একটা আছে বললে নির্ঘাত তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ধরেই নেবে, উনিও তাঁর বাবার মতো বালিশের ভিতরে টাকাপয়সাই রেখে যাচ্ছেন। এটা ভেবেই হয়তো খুড়োমশাই মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলছেন না। তবে না বললেও, এই ভাবে তাঁর বালিশ আগলে রাখা দেখেই সবাই আন্দাজ করছে, ওই তেলচিটে বালিশটার মধ্যে কী আছে—

তবু এ জিজ্ঞেস করে, ও জিজ্ঞেস করে, সে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু উনি কাউকেই কিছু বলেন না। কায়দা করে ঠিক এড়িয়ে যান। আর উনি যত এড়িয়ে যান, ততই সবার সন্দেহ বাড়তে থাকে। নিশ্চয়ই ওটার মধ্যে তেমন কিছু আছে।

আসলে খুব ছোটবেলায় একদিন হঠাৎ করে উনি বাড়ি থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে এলেন তখন প্রায় প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছেন। উনিই বললেন, হাতের লেখা অত্যন্ত খারাপ বলে বাবা এমন বকেছিলেন যে, উনি নাকি রাগ করে যেদিকে দু'চোখ যায়, সে দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন এবং হাঁটতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন যে বহু দূরের একটা রেলস্টেশনে। সেখানে গিয়ে কোনও কিছু না জেনেই একটা দূরপাল্লার ট্রেনে চেপে বসেছিলেন। একদম শেষ স্টেশনে নেমে উনি যখন খিদের জ্বালায় কাঁদছিলেন, সে সময় এক দম্পতি তাঁকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁরা নাকি খুড়োমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কে কে আছে? তখন খুড়োমশাই নাকি বলেছিলেন, আমার কেউ কোথাও নেই। আমি একা। তখন তাঁরা একটা ভালো দিনক্ষণ দেখে মহা ঘটা করে তাঁকে দত্তক নিয়ে নেন।

তাঁদের ছিল দেশজুড়ে নানা রকমের ব্যবসা। তাঁরাই তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী হলেও তাঁর হাতের লেখা এত খারাপ ছিল যে, বেশিরভাগ লোক তার পাঠোদ্ধার করা তো দূরের কথা, বুঝতেই পারত না, ওটা বাংলা, উর্দু না চীনা ভাষায় লেখা। তবু তিনি অনেক দূর পর্যন্ত পড়েছিলেন। পড়াশোনার পাট চুকে যাওয়ার পরে সেই ব্যবসা উনি দেখাশোনা করতে লাগলেন এবং সেই ব্যবসাতে তিনি এতটাই ডুবে গেলেন যে, যখন হুঁশ হলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তত দিনে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন সেই দম্পতিও। ফলে সমস্ত ব্যবসার একচ্ছত্র মালিক হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু তিনি ব্যবসাটা পুরোপুরি হাতে নেওয়ার পরেই নাকি সেই ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে শুরু করে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই একদম লাটে উঠে যায় যাবতীয় ব্যবসাপত্র।

উনি যখন এখানে আসেন তাঁর তখন একগাল দাড়ি। পরনে জোব্বা মতো কী

একটা। পিঠে বিশাল বড় একটা বোঁচকা। শরীরটাও কেমন যেন জুবুথুবু। তাঁকে দেখে প্রথমে তো কেউ চিনতেই পারেনি। যখন চিনল, তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো একটা ঘর। ভাইয়েরা 'দাদা দাদা' বলে ডাকলেও, ভাইদের কোনও ছেলে-মেয়েই তাঁকে আর 'জেঠু' বলে ডাকতে পারল না। কারণ, তাঁর কথা তারা জানতই না। শোনেইনি কোনও দিন। ফলে তাঁর পরের ভাইকেই ওরা জেঠু বলে ডাকত। একজন জলজ্যান্ত জেঠু থাকতে আর একজনকে কী নতুন করে জেঠু ডাকা যায়। না, এক নম্বর জেঠু, দু'নম্বর জেঠু; কিংবা বড় জেঠু, ছোট জেঠু অথবা নতুন জেঠু, পুরনো জেঠু, বলা যায়? তাই তারা ডাকা শুরু করল খুড়োমশাই বলে। আর তাদের দেখাদেখি সবার কাছেই তিনি হয়ে উঠলেন—খুড়োমশাই।

সব ক'টা ভাই-ই তাঁদের ঘর হাট করে খুলে রাখলেও তিনি কিন্তু তার ঘর সবসময় আটকে রাখতেন। ঘরে থাকলে ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিতেন। আর সামান্য সময়ের জন্য বাইরে গেলেও দরজায় তালা আটকে যেতেন। তাঁকে তখন ভাই-বউরা খেতে-পরতে দিলেও তাঁর মনে হতে লাগল, কেউ যেন তাঁকে ঠিক মতো কদর করছে না। তাঁকে মানুষ বলে মনে করছে না।

এর পরেই হঠাৎ একদিন সবাই দেখল, চোস্তা-পাঞ্জাবি পরে সক্কাল সক্কাল তিনি বেরোচ্ছেন। হাতে একটা বালিশ। তাঁকে ও ভাবে যেতে দেখে কে যেন বলে উঠেছিল, কই যাও গো খুড়োমশাই?

উনি বলেছিলেন, কই আর যামু? যাওয়ার জায়গা তো একটাই। চুলার দুয়ার।

---এ সব কথা বলতে নেই গো খুড়োমশাই। হাতে ওটা কী?

—শকুনের চোখ ঠিক ভাগাড়ের দিকে, না? দেখতাছিস না বালিশ।

—সে তো দেখছিই। কিন্তু বালিশ নিয়ে যাও কই?

—তোর হাউড়ির কাছে।

—আমার শাশুড়ি তো অনেক দিন আগেই স্বর্গে চলে গেছে গো....

—আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি।

না। সেদিন সারা দুপুর আর বাড়ি ফেরেননি উনি। ফিরেছিলেন সেই রাত্রে। রাত্রেও কিছু দাঁতে কাটেননি। সারা দিন কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, কী খেয়েছিলেন কাউকেই কিছু বলেননি। তবে তার পর থেকেই তাঁর হাতে দেখা যেত লাগল সেই বালিশটা। বালিশ নিয়ে তাঁর আদিখ্যেতা দেখে প্রথম প্রথম সবাই হাসাহাসি করলেও কিছু দিন পর থেকেই অনেকে বলতে শুরু করল, হয়তো সারা জীবনের সঞ্চয় উনি ওটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই যক্ষের মতো সারাক্ষণ ওটাকে আগলে রাখেন। কিন্তু আগলে রাখলেও উনি আর কত দিন! বয়স তো কম হলো না। কবে দুম্ করে চোখ বুজবেন, কোনো ঠিক আছে?

চোখ বুজলে কে পাবে ওটা। কাকে দিয়ে যাবেন উনি। পেতে গেলে তো ওঁর মন জয় করতে হবে। উনি যা খেতে ভালবাসেন, তা ওঁর মুখের সামনে এগিয়ে দিতে হবে। দরকার হলে তাঁকে আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে উনি যে টিভি সিরিয়াল দেখতে পছন্দ করেন, নিজেদের ভালোলাগা, মন্দলাগা জলাঞ্জলি দিয়ে সেটা খুলে দিতে হবে। ইদানীং ওঁর খুব চাকুমচুকুম খাওয়ার জিভ বেড়েছে। প্রয়োজন হলে সেই মতো আইসক্রিম, বনকুল—না, দোকান থেকে নয়, পাতি হজমিওয়ালার কাছ থেকে হজমিমাখা, চালতার আচার এনে দিতে হবে। এবং সবথেকে যেটা বড় কথা, সেটা হলো—ওঁর কোনও কথাতেই রাগ করা চলবে না। যত কষ্টই হোক, যত বিরক্তই লাগুক, ওঁর মুখের উপরে 'না' বলা চলবে না। ইচ্ছে না করলেও ওঁর মন জুগিয়ে চলতে হবে।

প্রত্যেকটা ভাইয়ের ছেলে-মেয়েই তাঁকে তোয়াজ করে চলতে লাগল। শুধু তোয়াজ নয়, তোয়াজের যেন বন্যা বয়ে যেতে লাগল। এ এটা করে তো, সে সেটা করে। কে কাকে টেক্কা দেবে, তা নিয়ে যেন অলিখিত কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেল। খুড়োমশাই নিজেও টের পেতে লাগলেন, নিজের ছেলে-মেয়ে থাকলেও এমন সেবা বুঝি তাঁকে কেউ করত না। দারুণ সুখে আছেন তিনি। তিনি যত সুখে আছেন, ঠিক ততটাই অ-সুখে আছে বাকিরা। কেউই আন্দাজ করতে পারছে না, ওই বালিশের ভিতরে ঠিক কত ভরি সোনা আছে। কত হিরে-জহরত আছে। কত জমিজমার দলিল আছে এবং নগদ কত টাকা আছে। তবে, যাই থাকুক না কেন, সেটা যে খুব একটা কম নয়, এ ব্যাপারে বাড়ির প্রায় সকলেই নিশ্চিত।

এমন সময় দিন কয়েকের জন্য এই বাড়ির সেজ মেয়ে ঘুরতে এল তার বাবা-মায়ের কাছে। সঙ্গে তার ছোট মেয়ে চম্পা। সামনের বার নাকি উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। যেমন ছটফটে, তেমনই মিশুকে। তেমনই আবার বাচাল। কোনও কথা পেটে রাখতে পারে না। হড়হড় করে বেল দেয়। সব সময় তার মুখে যন কথার ফুলঝুড়ি ফুটছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ব্যস, তার মধ্যেই সে খুড়োমশাইয়ের এমন নেওটা হয়ে গেল যে, তা বলার নয়। সে আগেই মায়ের কাছে শুনেছিল ওই বালিশের কথা। এখন স্বচক্ষে সেটা দেখে সে বলেই ফেলল, এর মধ্যে কী আছে গো? খুড়োমশাই তো কিছুতেই বলবেন না। মেয়েও তেমনই নাছোড়বান্দা। অবশেষে প্রায় আধঘণ্টার পীড়াপীড়িতে খুড়োমশাইয়ের মুখ থেকে সে বের করে ফেলল, ওই বালিশের মধ্যে কী আছে—

যদিও সেটা বলার আগে খুড়োমশাই বারবার করে বলে দিয়েছিলেন, আমি তোকে যা বললাম, তুই কিন্তু এটা আর কাউকে বলিস না, কেমন?

উনি বারণ করলে কী হবে, বরং উনি বারণ করেছেন বলেই হয়তো ওর মনের মধ্যে যুদ্ধ জেতার একটা দম্ভ কাজ করছিল। এত দিনেও কেউ যেটা করতে পারেনি, মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টাতেই ও সেটা করে ফেলতে পেরেছে। আর সে যে এটা পেরেছে, সেটা জাহির করার জন্যই জনে

জনে সে বলে বেড়াতে লাগল, একটা কথা বলছি শোনো, কাউকে কিন্তু বোলো না। খুড়োমশাই আমাকে পইপই করে বলতে বারণ করে দিয়েছেন, আমাকে শুধু বিশ্বাস করেন বলেই বলেছেন। আমিও তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি, খুড়োমশাইয়ের ওই বালিশের মধ্যে না—অনেগুলো মোহর আছে।

মোহর! তার মানে, যাঁরা ওঁকে দত্তক নিয়েছিলেন, তাঁদের মৃত্যুর পরে ওই বিপুল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ায় তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, যতই ওঁরা লিখে দিয়ে যান না কেন, ওই দম্পতির নিকট আত্মীয়রা নিশ্চয়ই এটা ভালো চোখে দেখছেন না। তলে তলে হয়তো নানারকম ষড়যন্ত্র করছেন। তাই তিনি কৌশল করে বিশাল সম্পত্তি হাতিয়ে রাতারাতি সব ক'টা ব্যবসাকে চৌপাট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অত সম্পত্তি তো একদিনে সরিয়ে ফেলা যাবে না। তাই সেটাকে খুব ছোট আকার দেওয়ার জন্য উনি এই মোহরগুলো কিনেছিলেন।

চম্পার মুখ থেকে বাড়ির লোকেরা, বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে পাড়াপ্রতিবেশীরা, পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছ থেকে গোটা গ্রাম, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সেই খবর। আর এ খবর যে-ই শুনল সে-ই লাফিয়ে উঠল। এবং বলল, শেষ পর্যন্ত তা হলে উনি স্বীকার করলেন। অবশ্য স্বীকার না করেই বা উপায় কী। উনিও তো বুঝতে পারছেন, উনি মুখে না বললেও সবাই টের পাচ্ছে ওই বালিশের মধ্যে কী আছে। ফলে বাধ্য হয়েই উনি বলেছেন। আর যেই এটা বলেছেন, ব্যাস, অমনি খুড়োমশাইকে সেবা করার জন্য যেন সবাই উঠেপড়ে লেগেছে। এমন যত্ন-আত্তির ধুম যে খুড়োমশাইয়ের প্রাণ যায় যায়। প্রত্যেকেই বলতে লাগল, আমি জানতাম ওটার মধ্যে এ রকমই কিছু একটা আছে। না হলে খুড়োমশাই ওটাকে ওভাবে কখনও আগলে রাখেন!

কিন্তু মোহর থাকলেও ওটার মধ্যে ঠিক ক'খানা মোহর আছে। এটা নিয়ে সকলেই বেশ চিন্তিত। চিন্তিত আর একটা বিষয় নিয়েও—উনি কি মরার আগে কোনও একজনকে বালিশটা দিয়ে যাবেন, নাকি সবাইকে ডেকে বলবেন, এখানে যা আছে, তোরা সবাই মিলে ভাগ করে নে। নাকি নিজের মর্জি মতো কাউকে বেশি, কাউকে কম, এই ভাবে ভাগ করে দেবেন। আর উনি যদি ভাগ করে দেওয়ার মতো অবস্থায় না থাকেন কিংবা কাউকে দেওয়ার আগেই যদি চোখ বোজেন, তখন!

সবাই তক্কে তক্কে আছে ওঁর কিছু হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। না। কেউই কাউকে একা কিছু নিতে দেবে না। যে ক'টা মোহর আছে, সবাই ভাগ করে নেবে। উনি তো আর বোকা নন, নিশ্চয়ই মাথা পিছু একটা হিসেব করেই রেখে যাচ্ছেন। আর তা যদি নাও রেখে যান, তা হলে যে ক'টা মোহর পাওয়া যাবে, তা বিক্রি করে সেই টাকা সবাই মিলে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে।

কেউ কেউ এটা বললেও, কেউ কেউ আবার এর-ওর সঙ্গে শলাপরামর্শও করতে লাগল। মেয়েদের তো বিয়ে হয়ে গেছে, তারা কেন ভাগ পাবে? কেউ বলল, বড়দার তো প্রচুর টাকা ও আবার এটায় ভাগ বসাবে নাকি? কেউ বলল, দ্যাখ, আমার দুটো ছেলেই তো বেকার, আমার কথাটা একটু মাথায় রাখিস। আমার মনে হয়, ফোকটেই যখন পাচ্ছি, যার অবস্থা যত খারাপ, তাকে তত বেশি টাকা দেওয়া উচিত।

রোজই এসব নিয়ে চলছে। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করে আছে কী হয় কী হয়। না। কারও চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই খুড়োমশাইয়ের অসুস্থতা নিয়ে নয়, ঘুম নেই খুড়োমশাইয়ের কিছু হলে ওই বালিশের কী হয়, তা নিয়ে। উনি আবার কোনও উইলটুইল করে যাননি তো।

অবশেষ খুড়োমশাই একদিন সত্যি সত্যিই চোখ বন্ধ করলেন। করলেন মানে চিরদিনের জন্যই করলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন সব ক'টা ভাই, ভাইবউ, ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনি, এমন কী মেয়েরাও।

সবাই খুড়োমশাইয়ের ঘরে গিয়ে ভিড় করল ঠিকই, কিন্তু কেউই খুড়োমশাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না। সবার চোখ তখন ওই বালিশটার দিকে। সবারই এক কথা, আগে বালিশটা খোলো। ভিড়ের মধ্যে কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে গিয়েছিল, আগে দাহটা সেরে এলে হতো না...

না! কে যেন বেশ জোরের সঙ্গেই ধমক দিয়ে উঠল। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলল—না।

অবশেষে সবার সামনে বালিশটা খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ব্লেড দিয়ে চেরা হলো। এত যত্ন করে চেরা হলো, যাতে বালিশের ভিতরে তুলোর গায়েও যেন না লাগে। না। এতটুকুও আঘাত লাগল না। ওখানে উপস্থিত থাকা, বালিশের ভিতর থেকে কী বেরোয়, তা দেখার জন্য বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে ভাই, ভাইবউ, ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনি, এমনকী বোনেরাও। সবাই দেখল, না। মোহর নয়। বালিশের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সাদা রঙের একটা লম্বা মতো খাম। খামটার মুখ আঠা দিয়ে আটকানো। সেটা খুলতেই বেরিয়ে এল ভাঁজ করা এ-ফোর সাইজের ধবধবে একটা পাতা। আর তাতে বিশাল বড় বড় হরফে কালো কালি দিয়ে কমপিউটারে লেখা দু'টি শব্দ—কেমন দিলাম?

লেখাটা দেখে সবাই এতটাই হতাশ হলো যে, কারও মুখে আর কোনও কথা ফুটল না। সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from New Delhi Rly. Station
Only 1 km. from Cannaought Place
Homely Atmosphare
Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road, Ram Nagar, Pahar Ganj
New Delhi - 110055 (India)

Phones : +91 11 43505463 (10 Lines)
Cont : 9811044543

E-mail : info@aryatouristlodge.in
website : www.aryatouristlodge.in

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

পাতালপুরীর রহস্য

অজয় ভট্টাচার্য

গভীর রাত। খাটে এপাশ-ওপাশ করছিলাম। হঠাৎ যেন মেঝে থেকে উঠে এল আওয়াজটা। শুনেছি মিশরীয়দের মৃত্যুর দেবতা ওসিরিসের দরবার পাতালে। আওয়াজটা কি সেখান থেকে এল! সাত-পাঁচ ভাবছি। হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে উঠে এল একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ভয়ে দরদর করে ঘামছি। ধীরে ধীরে ধোঁয়ার কুণ্ডলীটি বদলে গেল একটি মানব শরীরে। মুখটা শেয়ালের মতো। তাহলে কি এই সেই মৃত্যুদূত আনুবিস? আমাকে নিয়ে যাবে ওসিরিসের দরবারে। ঘুরে-ফিরে আমাকে দেখছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি?

গুরুগম্ভীর স্বরে আওয়াজ এল, 'মৃত্যুদূত'।

—কিন্তু আমি তো এখনও মরিনি!

—আশীর্বাদ দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করে বলল, 'তোমার সময় পূর্ণ হয়েছে। এবার তোমায় যেতে হবে।'

—কোথায়?

—'দুই সত্যের সভাগৃহে। সেখানে তোমার বিচার হবে।'

—'বিচার হবে মানে! আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। তাহলে কীসের বিচার?"

—শান্ত হও। ন্যায়-অন্যায় বোঝা যাবে মমিফিকেশনের পর।

দেবদূতের মতলব তো ভালো ঠেকছে না। আমাকে খুন করতে চাইছে।

মুখে বললাম, 'তাই বলে জীবিত মানুষের মমিফিকেশন?'

—'কে বলল, তুমি জীবিত! জীবিত হলে রাজার এত অন্যায় মুখ বুঝে সহ্য কর কীভাবে? তোমাদের মতো রাজনীতির কারবারিদের জন্যেই চারদিকে এত অত্যাচার, অনাচার। দুর্নীতির টাকায় পুকুর বুজিয়ে প্রাসাদ বানিয়েছ।

স্বার্থপরের মতো প্রকৃতিকে ক্ষতবিক্ষত করেছ। আর এখন বলছ, তুমি নির্দোষ!

—'কিন্তু জীবিত মানুষের মমিফিকেশন—সে তো এক প্রকারের হত্যা!'

—'হত্যা নয়, শাস্তি। ভেবে দেখ তোমার সমাজকে কতটা বিষিয়ে দিয়েছ। ঘুষ ছাড়া এখানে কোনো কাজ হয় না। তাই এই শাস্তি তোমার প্রাপ্য।'

বলতে বলতে এগিয়ে এল আমার দিকে। হাতে একটি লোহার শলাকা। হয়তো লোহার শলাকা দিয়েই মমিফিকেশনের কাজ শুরু করবে। ভাবতে ভাবতেই ভয়ে কাঠ হয়ে এল শরীর। দৌড়ে পালাতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে খাটের সঙ্গে। বাধাও দিতে পারছি না। সকল শক্তি যেন শুষে নিয়েছে দেবদূত। হঠাৎ নাকের ছিদ্র দিয়ে সজোরে শলাকাটি পুরে দিল মস্তিষ্ক পর্যন্ত। শলাকা দিয়ে মাথার ঘিলু টেনে টেনে বার করতে লাগল। ও কী অসহ্য যন্ত্রণা! ছটপট করতে করতে চিৎকার করে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি, এবার থেকে আমি ন্যায়ের পথে চলব।'

রক্তমাখা ঘিলু ছিটকে পড়তে লাগল চারদিকে। নাক দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত। মাথাটা বন বন করে ঘুরছে। শুধু কানে এল একটা কথা, 'সিস্টার অক্সিজেনের নলটা ভালো করে পেশেন্টের নাকে পুরে দিন।' তারপর আর কিছু মাথায় ঢোকেনি। জ্ঞান ফেরার পর দেখি ডাক্তারবাবু স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমার বুকের ধুকপুকুনি মন দিয়ে শুনছেন। পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীকে বললেন, 'মনে হচ্ছে আর কোনো ভয় নেই। কিন্তু ট্রমা-টা বেশ কিছুদিন থাকবে। তবে আমরা আরও দু'একদিন দেখে নিতে চাইছি। একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়ে নিতে হবে। পেশেন্টকে বেশি বিরক্ত করবেন না।' সিস্টারের কড়া পর্যবেক্ষণ এড়িয়ে আমার স্ত্রী ফিস ফিস করে বলল, ক'টা দিন যা ভুল বকছিলে। খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম! 'মমিফিকেশন'-এর বইটি আমি ফেলে দিয়েছি। ওসব ছাইপাঁশ পড়েই তোমার এই অবস্থা।

—কিন্তু মেঝেতে ফাটল ধরল কী করে?

—পুকুর বুজিয়ে বাড়ি বানানোর খেসারত। ইঞ্জিনিয়ার তো তাই বলল।

ব্যাখ্যাটি ভালো। তবুও মন মানছে না। দু'দিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলাম। এখন শুধু রাতে নয়, দিনেও আওয়াজটা পাই। ঠকঠক করে কী যেন হচ্ছে। কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমি আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পাই। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠে। পাতালপুরীতে নিশ্চয় কিছু আছে। জলাজমি বুজিয়ে ইমারত না বানালেই হতো।

With Best Compliments from -

SPORTSLINE

Certified Substantial Sports Protection
Made in India
H-29, Udyog Nagar Industrial Area, Near Peeragarhi
New Delhi - 110041, India
+91-11-25470502, +91-11-49052142
sportslineindia@gmail.com
www.sportshelmet.com

শেক্সপিয়রের বরপুত্র

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ফর্সা, ছিপছিপে বেতের মতো শরীর, মাথায় টাক আর খাড়া নাক। এই নিয়ে এক অসীম মোহময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমাদের ইংলিশ জেঠু।

আমি টিটো। ইংলিশ জেঠু আমার বাবার নিজের ছোটোমামা। সম্পর্কে আমার দাদু হলেও আমরা যারা ওঁর কাছে ইংলিশ পড়েছি, সবাই ওনাকে ইংলিশ জেঠু বলেই ডাকি। এমনকী আমার বাবাও। ছোটো দাদুর এই ইংলিশ জেঠু নামটা কে যে কবে শুরু করেছিল কে জানে! এখন ছাত্র-ছাত্রীরাই শুধু নয়, তাদের বাবা-মারাও তাঁকে ইংলিশ জেঠু বলেই ডাকে। নামটা এখন এই এলাকায় সর্বজনীন!

এহেন ইংলিশ জেঠু একসময় বড় একটা বেসরকারি কোম্পানির খুব উঁচু পদে কাজ করতেন। অবসর নেওয়ার পর শুরু করলেন পড়ানো। এ তল্লাটে আমরা যারা একটু-আধটু ইংরেজি শিখেছি, তা তাঁরই কল্যাণে। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গিটি ছিল অসাধারণ। তাঁর হাতের ছাগুলে গাঁট্টা খায়নি এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী এই তল্লাটে বিরল। একই ভুল বারবার করলে যে গাঁট্টা তিনি মারতেন সেটাকে আমরা নাম

দিয়েছিলাম ছাগুলে গাঁট্টা। বল স্পিন করানোর কায়দায় কবজির মোঁচড়ে মুহূর্তে মাথায় ছোট্টো একটা আলু গজিয়ে দিতেন। খুব একটা না লাগলেও একদিন ব্যথা থাকবেই। আর এটা খাওয়ার পর ভুলের পুনরাবৃত্তি কারও কখনো হয়েছে বলে শুনতে পাইনি।

আমাদের পাশের পাড়াতেই ছিল আমার বাবার মামার বাড়ি। আমার বড়োদাদু অর্থাৎ আমার বাবার বড়োমামা এবং আমার ছোটোদাদুর চরিত্রের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাত। বড়োদাদু রাশভারী বৈজ্ঞানিক, আর ছোটোদাদু মজাদার, দিলখোলা এক মানুষ। পৃথিবীর কাউকে ভয় না করলেও এই বড়োদাদুকেই ছোটো দাদু একটু ভয় ভক্তি করতেন।

এই গল্পের আরও এক প্রধান চরিত্র হচ্ছেন আমার ঠাকুরদা অর্থাৎ বাবার বাবা। ইংলিশ জেঠুর যত রাজ্যের কীর্তি-কাহিনি তাঁর কাছ থেকেই আমি শুনেছি। ইংলিশ জেঠু লেখাপড়ায় এমনিতে ভালো হলেও পড়াশোনার চাইতে আড্ডা, খেলাধুলাই বেশি পছন্দ করতেন।

তখনকার দিনে নিয়ম ছিল সন্ধ্যা নামলেই বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু ইংলিশ জেঠু কোনোদিনই ঠিক সময় বাড়ি ফিরতেন না। দাদু বলেছিলেন, এর সঙ্গে ইংলিশ জেঠুর ছিল পরোপকারের নেশা। মড়া পোড়াতে গিয়ে বা এইসব পরোপকার করতে গিয়ে কত যে ঘটনার ঘনঘটা ঘটিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আমার দাদু তাঁর এই ছোটো শ্যালকটিকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। প্রায়ই গল্পে গল্পে ইংলিশ জেঠুর কত যে কাণ্ড শুনিয়েছেন তা লিখতে শুরু করলে মহাভারত হয়ে যাবে। দাদুকে প্রশ্ন করেছিলাম—''এই যে দেরি করে ইংলিশ জেঠু ফিরতো, তা কেউ কিছু বলতো না?'' দাদু বলেছিল—''বলতো না আবার।'' প্রতিদিনই প্রায় বকা খেত দাদার কাছে। বাড়ির সবার কাছে।

—''তবু শুধরাতো না!'' —আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম।

— ''নারে, এমন সব উদ্ভট উদ্ভট কারণ বের করে তোদের ইংলিশ জেঠু কথার মোড় ঘুরিয়ে দিত যে, বকাবকিটাই মুলতুবি হয়ে যেত।'' একবার বুঝলি—দাদু বলতে থাকলো, ''দেরি করে ফিরে কৈফিয়ত দিয়েছিল পাড়ার ধোপা রাম খিলাওনের গাধাটা নাকি অঙ্ক কষে নির্ভুল যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে দিচ্ছে! সবার তাক লেগে যাচ্ছে! সবাই দলে দলে দেখতে যাচ্ছে। সেটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে তারও দেরি হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, গাধাটাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আসতে হলো বলেই তার বাড়ি ফিরতে এত দেরি হলো।''

এমন অদ্ভুত কথা শুনে সবাই ইংলিশ জেঠুকে ছেড়ে দিল? নিনিরা কিছু বলেনি?

—''তোর ঠাকুমা অর্থাৎ নিনি উলটে প্রশ্ন করেছিল''—''গাধা কী করে অঙ্ক কষবে? দেরি করে বাড়ি ফিরে মিথ্যে কথা বলতে তোর লজ্জা হয় না?''

''উলটে তোর ইংলিশ জেঠু কী বলেছিল জানিস?'' আমি মাথা নেড়ে বললাম—''না''।

''ঠিক তোর মতো মাথা নেড়ে গাধাটা নাকি অঙ্ক করে দিচ্ছিল।''

''মানে? তুমি কি আমাকে গাধা বললে নাকি?''

''না তো আমি তো গাধাকে তোর মতো বলেছি!''

মুচকি হেসে দাদু বলেছিল, ''তা যাই হোক।'' শোন্, এরপর তোদের ইংলিশ জেঠু বলল গাধাটাকে দুই আর দুই যে কত হয় জিজ্ঞাসা করলে চারবার মাথা নাড়াচ্ছে। দশ আর দশে কত হয় প্রশ্ন করলে কুড়ি বার মাথা নাড়াচ্ছে। এমনভাবেই যোগ, বিয়োগ করে যাচ্ছে। তা তোদের ইংলিশ জেঠু নাকি পরীক্ষা করার জন্য পঁচিশ আর পঁচিশে যোগ করলে কত হয় জিজ্ঞাসা করার পরেই প্রশ্ন করেছিল তার সঙ্গে পঞ্চাশ বিয়োগ করলে কত হয়। আর তাতেই গাধাটা নাকি পঞ্চাশ বার মাথা নাড়ার পর যেই শূন্য দেখাবার জন্য মাথাটা গোল করে ঘুরিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে চার পা চিতিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর তাকে হাসপাতালে দিয়ে বাড়ি আসতেই নাকি তোদের ইংলিশ জেঠুর দেরি হয়েছিল। এরপরও কি কেউ তাকে আর কিছু বলতে পারব? আবার কোনোদিন দেরি করে এসে বলল যে কে একজন মাটিতে একটা টাকা পুঁতেছিল তার থেকে গাছ গজিয়েছে। খবরের কাগজের লোকেরা এসে দেখে গেছে। তিনিও সেখানে গিয়ে দেরি করে ফেলেছেন।'' একটু থেমে দাদু বললো—''নিত্যনতুন এমনতরো অজুহাত সৃষ্টি করলেও প্রতিটা পরীক্ষায় মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট করতো তোদের ইংলিশ জেঠু।'' কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি ছিল ইংলিশে তোদের ইংলিশ জেঠু পাশ করত একদম টায়েটুয়ে, কোনোমতে কান ঘেঁষে।

এতটা শুনে আর থাকতে না পেরে দাদুকে বলে উঠেছিলাম— ''এবার তোমার লেগেছে ইংলিশ জেঠুর ছোঁয়া।''

এবার কিন্তু তুমি গুল দিচ্ছ। যে মানুষটার ইংলিশে এত নাম ডাক। পাড়ার রিকশাওয়ালা থেকে দোকানদার, বাজারের লোকেরা যাকে ডাকে কিনা ইংলিশ জেঠু বলে, সে কিনা প্রতিবছর গণ্ডায় গণ্ডায় ছাত্র-ছাত্রীকে ইংলিশ পড়াচ্ছে, সে কিনা ইংলিশে ভালো ছিল না? আশ্চর্য!

একদম সত্যি—দাদু বলল, তবে কিনা যেদিন কবি শেক্সপিয়রের আশীর্বাদ পেল সেদিন থেকে বদলে গেল তোদের ইংলিশ জেঠু।

আরও একটা গল্পের গন্ধ নাকে এসে লাগছিল।

দাদুকে দেখি রকিং চেয়ারে দুলতে

দুলতে মুচকি মুচকি হাসছে আর সুকুমার রায় আওড়ে বলছে—

''আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা,
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়।
আয়রে পাগল, আবোল তাবোল,
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।''

চেপে ধরলাম দাদুকে, কী ঘটেছিল বলতেই হবে। আরাম করে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে দাদু বলল—''সে অনেক কথা। যা আগে তোর মাকে বল্, একটু চা দিতে।''

''বলছি, কিন্তু গল্পটা বলতেই হবে।''—মাকে চায়ের কথা বলেই এসে বসলাম দাদুর কাছে।

''তখন তোদের ইংলিশ জেঠু পড়ে ক্লাস সেভেন কী এইটে।'' চোখ বুঁজে দুলতে দুলতে শুরু করল দাদু।—''বেশ ছোটো। এমনিতে লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু একটা সাবজেক্ট ছাড়া। ইংলিশটাকে তোদের ইংলিশ জেঠু কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারতো না। পারবেই-বা কীকরে? যে ভাষায় পি-ইউ-টি পুট হয়, আবার বি-ইউ-টি বাট, তাকে কি আর তোদের ইংলিশ জেঠুর মতো সাদামাঠা সরল ছেলে সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারে? তার ওপর বিদেশিদের ভাষা, নিজের মায়ের ভাষা হলেও কথা ছিল! Mutual কেন মুটুয়াল না হয়ে মিউচুয়াল হবে বা Future কেন ফুটুরে না হয়ে ফিউচার হবে এসব ভাবনাই তোদের ইংলিশ জেঠুর মাথায় ঘুরে বেড়াত।''

''বাবা আপনার চা''—মায়ের হাত থেকে কাপটা নিয়ে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে, আবার শুরু করল দাদু।

—''শুধু এই একটা সাবজেক্টের জন্য সবার কাছে গঞ্জনা পেতে পেতে তোদের ইংলিশ জেঠু ভাবতো একটা বিদেশি ভাষা কীকরে এদেশে কে ভালো ছাত্র আর কে খারাপ ছাত্র তার মাপকাঠি তৈরি করে দিতে পারে!''

''যাই হোক'' —দাদু বলতে লাগলো—''একদিন একটা ট্রানস্লেশান করতে না পারার জন্য যৎপরোনাস্তি অপমানিত হতে হলো তোদের ইংলিশ জেঠুকে। মনের দুঃখে ছাদের ঘরে একা বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে! হঠাৎ একটা শব্দ হতে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে, ঘরে আরও একটা লোক! চোর নাকি! কিন্তু কী অদ্ভুত নাটকের চরিত্রের মত পোশাক! একটু কেমন যেন চেনা চেনাও ঠেকছে!

''কে তুমি? এখানে এলেই-বা কী করে?'' সাহস করে একটু জোরেই বলে উঠলো ইংলিশ জেঠু।

''আমাকে চিনতে পারছো না? আমার নাটক তো কাল রাতেও পড়ছিলে তুমি!''

''কাল রাতে তো আমি 'ম্যাকবেথ'; তবে তুমি মানে আপনি শেক্সপিয়র!'' ভয়ে বিস্ময়ে ইংলিশ জেঠুর গলা বুজে আসতে চায়।

''দাদু এটা কী হচ্ছে। শেক্সপিয়র বাংলা বলছেন?''

''কেন বলবেন না, স্বর্গে তো কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম সব পাশাপাশি বসে আড্ডা মারেন।''—আমি হতভম্ব।

দাদু বলতে লাগলো—''আর শেক্সপিয়র শব্দ করে কথা বলছেন এটা কি আমি বলেছি? কথা হচ্ছিল মানসিক তরঙ্গে। আর মানসিক তরঙ্গে তো শব্দের প্রয়োজন থাকে না।''

একটু হেসে বলল দাদু—''এটা ঠিক বুঝতে পারা যায়। তুই কি পুরোটা শুনবি না বাধা দিয়ে যাবি?''

''না, না বলো। তারপর?'' আমি চুপ করে গেলাম।

দাদু আবার বলতে লাগলো—''তুমি যখন খুব মন দিয়ে আমার নাটক নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিলে, আমি সেইসময় রোঁদে বেরিয়েছিলাম।''

ইংলিশ জেঠু জিজ্ঞাসা করলো—''সেটা আর কী?''

''আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে বের হই। আমরা মানে যত পরলোকগত কবি, গায়ক, সুরকার, নাট্যকার, বৈজ্ঞানিকের দল। কখনো একা, আবার কখনও দল বেঁধে।''

শেক্সপিয়রের কথা শেষ না হতেই ইংলিশ জেঠুর প্রশ্ন?—''কেন আপনারা এভাবে বেরোন?''

—''আমরা দেখি কে কী করছে। কারও কোনো সাহায্য লাগবে কিনা। এটাই ভগবানের আদেশ।''

একটু ঢোঁক গিলে ইংলিশ জেঠু বলে উঠলো—''তা আমার কাছে কেনো?''

''কাল যখন আমি, নিউটন আর কালিদাস রোঁদে বের হলাম, তখন কালি বলল—শেকু, ওই ছেলেটা তোমার ম্যাকবেথ পড়তে পড়তে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সর্দি বসে মরে না যায়।''

—''সেকি! আপনার সঙ্গে কালিদাস আর নিউটনও ছিলেন।'' ইংলিশ জেঠু প্রণামের ভঙ্গিতে বললো।

—''ছেলেটার ওজন বেড়ে গেছে। নিশ্চয় মন খারাপ।''

—''মন খারাপ হলে ওজন বেড়ে যায়! কী যাচ্ছেতাই কথা। এরপর তো বলবেন মড়ার চুল ছাঁটলে ওজন কমে যায়!''

—''বিশ্বাস হচ্ছে না! নিউটন একজন বৈজ্ঞানিক; ও বাজে কথা বলে না। তোমাদেরও দেশের আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্যদের থেকেও তো তোমরা বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের বেশি বিশ্বাস কর। তাহলে!''

—একটু বিরক্ত হয়েই বললেন শেক্সপিয়র। ''তাছাড়া জেনে রাখ, মন ভার হলে যেমন মনের ওজন বেড়ে যায়, মড়ার চুল কাটলেও মড়ার ওজন কমে।'' বেশি তর্ক করো না, ডেঁপো ছোকরা!''

''ঠিক আছে তর্ক করবো না। এরপর হয়তো বলে বসবেন— হয় হয় জানতি পারো না; সেটাই একরকম বললেন অবশ্য। কিন্তু, আমার কাছে কেনো?''

সাহস করে ইংলিশ জেঠু বললো।

—''কালিদাস বললো—তুমি নাকি ম্যাকবেথের অনুবাদ পড়ছিলে। আসলে মূল ভাষায় মূল জিনিস না পড়লে রস পাবে? যদিও এটাও কালিদাসেরই কথা, ও বলে ওর লেখার আসল রস পেতে গেলে সংস্কৃতে পড়তে হবে।''

''হ্যাঁ, প্রতিটা প্যারা উপরে ইংলিশে ছিল আর তার তলায় বাংলা মানে ছিল। কিন্তু সেটাও আপনার ইংলিশ নয়। আপনার ইংলিশ পড়তে গেলে আমি ঘেমে নেয়ে, গলে যেতাম। আমি ইংলিশ বুঝি না, একদম ওই সাবজেক্টটা আমার আসে না। আপনি আমার কাটা ঘায়ে নুন দিতে এসেছেন, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। আপনি এবার আসতে পারেন।'' রাগে দুঃখে ইংলিশ জেঠুর চোখ ফেটে জল এসে গেল।

''সে কী দাদু! ইংলিশ জেঠু শেক্সপিয়রকেও রেয়াত করেনি।''

''কী করবে? সবার অপমান আর কথার বিষে জর্জরিত ইংলিশ জেঠু সেদিন শেক্সপিয়রের উপরেই ঝাল মিটিয়েছিল।'' দাদুর গলা বেশ গম্ভীর।

'তারপর? বললাম আমি।

তারপর শেক্সপিয়র বললেন—''দেখো বাছা, তোমার কষ্ট লাঘবের জন্যই আমার এখানে আসা। আমার পাঠকের প্রতি তো আমার একটা কর্তব্য আছে। আমি বর দিচ্ছি আজ থেকে ইংলিশে তুমি হয়ে উঠবে দিকপাল।''

মিলিয়ে গেলেন শেক্সপিয়র।

''এটা গুল, পুরো গুল''—তীব্রভাবে বলে উঠলাম।

''গুল কিনা, তোদের ইংলিশ জেঠুকে দেখে বুঝিস না?''

সে যে শেক্সপিয়রের বরপুত্র সেটা তোদের দেখেই বোঝা যায়, নইলে তোরা কী করে ইংলিশে এত ভালো!''

এরপর আর কোনো কথা চলে না। দাদু মোক্ষম চাল চেলে দিয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলাম দাদু ফের সুকুমার রায় আওড়াচ্ছে—

রোদে রাঙা ইটের পাঁজা
তার উপরে বসলো রাজা।
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা
খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।

সত্যি, দাদু খাওয়ালো বটে, কিন্তু গিললাম কি?

With Best Compliments From :

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

ADMINISTRATION OFFICE :
1A, Raja Subodh Mullick Square, (5th Floor) Kolkata-700013
Phone : 2237 5919 / 2090 / 2822
Mobile : 9830020245 / 9831010261 / 9051060808 / 9163311779
E-mail : Kolkata@allindiatpt.com/airtalogistics@gmail.com
Web-site : www.allindiatpt.com
(H.O- 28, Black Burn Lane, Kolkata-700 012)
Behala : 363, Diamond Harbour Road, 14 No. Bus Stand,
M : 8981006500

TIME GURANTEED DELIVERY TRANSPORTERS FOR ALL OVER INDIA MARINE TYPE ISO CONTAINER TRUCKS AVAILABLE.
SPECIALIST IN ODC CARGOES BY HEAVYDUTY TRUCKS & TRAILERS.
SPECIALISTS IN PACKING OF HOUSEHOLD GOODS & TRANSPORTATION BANK APPROVED (IBA)

BRANCHES & ASSOCIATES ALLOVER INDIA

ANU SAREES

ANUSHREE TEXTILES PVT. LTD.

14, Amratalla Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001 (W.B.)
Phone : 033-22351257, E-mail : anusaree@gmail.com

With Best Compliments from -

AHUTI DEALERS PRIVATE LIMITED

CIN - U52390WB2010PTC154516
12/1, Nellie Sengupta Sarani, Kolkata- 700 087
Ph. No. 033-2252-3520, E-mail : ahutidealers2010@yahoo com

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ৭০৪৪০৯২০০০
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ৮৪২০০৭০৯৫৯

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ৭০৪৪০৮৮৪০৮

কাঁচড়াপাড়া ঃ ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

বারাসত ঃ ৫৬, কে এন সি রোড, হরিতলা, ফোন ঃ ৭০৪৪০৫০১৩৭

এবং বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, তমলুক, মেদিনীপুর।